বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 585.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

৪৯ বর্ষ। ৫৮৫ সংখ্যা। | বৈশাখ, ১৩১৯। | ১০ম কল্প। ১ম ভাগ।

	*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
আঃ	র	ম	শ	বু	শ	ম
শেঃ	৩০	৩২	৩২	৩১	৩১	৩০
	সো	শু	ম	শু	সো	বৃ
	†A	M	J	Jy.	Au.	S
	‡14	14	15	17	17	17
আঃ	সো	বু	শ	সো	বৃ	র
শেঃ	30	31	30	31	31	30
	ম	শু	র	বু	শ	সো

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩১৯ সাল।
ফসলী ১৩১৯—২০।
হিজরী ১৩২৯—৩০।
খ্রীষ্টাব্দ ১৯১২—১৩।
শকাব্দ ১৮৩৪।
সংবৎ ১৯৬৯—৭০।
মগী ১১৭৪—৭৫।
ব্রাহ্ম সংবৎ ৮৩—৮৪।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
আঃ	বৃ	শ	সো	ম	বৃ	শু
শেঃ	৩০	৩০	২৯	৩০	২৯	৩১
	শু	র	সো	বু	বৃ	র
	O	N	D	J	F	M
	17	16	16	14	13	14
আঃ	ম	শু	র	বু	শ	শ
শেঃ	31	30	31	31	28	31
	বৃ	শ	ম	শু	শু	সো

র	র	শ	বু	শ	ম	§১	৮	১৫	২২	২৯	বৃ	শ	সো	ম	বৃ	শু
সো	বু	র	বৃ	র	বু	২	৯	১৬	২৩	৩০	শু	র	ম	বু	শু	শ
ম	বৃ	সো	শু	সো	বৃ	৩	১০	১৭	২৪	৩১	শ	সো	বু	বৃ	শ	র
বু	শু	ম	শ	ম	শু	৪	১১	১৮	২৫	৩২	র	ম	বৃ	শু	র	সো
বৃ	শ	বু	র	বু	শ	৫	১২	১৯	২৬		সো	বু	শু	শ	সো	ম
শু	র	বৃ	সো	বৃ	র	৬	১৩	২০	২৭		ম	বৃ	শ	র	ম	বু
শ	সো	শু	ম	শু	সো	৭	১৪	২১	২৮		বু	শু	র	সো	বু	বৃ

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃ এঃ,	১৪	১৪	১১	৮	৭	৬
পূঃ	১৮	১৭	১৫	১৩	১১	১০
কৃঃ এঃ,	৩০	২৯	২৬	২৪	২২	২১
অঃ,	৪	৩১	৩০	২৭	২৬	২৪

আঃ—আরম্ভ। শেঃ—শেষ।
শুঃ এঃ—শুক্ল একাদশী, পূঃ পূর্ণিমা
কৃঃ এঃ-কৃষ্ণ একাদশী, অঃ-অমাবস্যা

*** ১৪ই বৈশাখ শনিবার ও ১৩ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার, শুক্ল একাদশী ১৮ই বৈশাখ বুধবার ও ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা। ৩০শে বৈশাখ সোমবার ও ২৯শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, কৃষ্ণ একাদশী, ৪ঠা বৈশাখ বুধবার ও ৩রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

* বৈ-বৈশাখ রবিবার আরম্ভ ও ৩০শে সোমবার শেষ। ১লা বৈশাখ ইং ১৪ই এপ্রেল।

† A এপ্রেল আরম্ভ সোমবার, শেষ ৩০শে মঙ্গলবার।

‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৪ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ রবিবার, ২রা সোম ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, ২রা বুধ ইত্যাদি।

বৈশাখ রবিবার } ১, ৮, ১৫,
জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার } ২২, ২৯।

এক এক দিকে ৬টী করিয়া দুই দিকে ১২ মাসের গণনা।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃ এঃ,	৫	৫	৫	৫	৫	৫
পূঃ,	১০	৯	৯	৯	৯	৯
কৃঃ এঃ,	২০	১৯	১৯	১৯	১৯	২০
অঃ	২৪	২৩	২৩	২৪	২৩	২৪

*** ৫ই কার্ত্তিক সোমবার ও ৫ই অগ্রহায়ণ বুধবার, শুক্ল একাদশী। ১০ই কার্ত্তিক শনিবার ও ৯ই অগ্রহায়ণ রবিবার পূর্ণিমা।

২০শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার ও ১৯শে অগ্রহায়ণ বুধবার, কৃষ্ণ-একাদশী। ২৪শে কার্ত্তিক শনিবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

এইরূপ মধ্যম স্তম্ভের তারিখের সহিত বাম বা দক্ষিণ স্তম্ভের মাস, বার মিলাইয়া ধরিলে মাস, বার ও তিথি ঠিক হইবে।

নববর্ষ।

নববর্ষ সমাগমে মানবের মনে কত নব ভাবের উদয় হয়। এই সময়ে বিগত বৎসরের সমস্ত অবসাদ, নৈরাশ্য, দুর্ব্বলতা, ক্ষণেকের জন্য হৃদয় হইতে দূরে পলায়ন করে। যে চির দরিদ্র, নববর্ষে তার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে এই আশায় সে উৎসাহিত হয়। যে চিররুগ্ন, এখন হইতে সে স্বাস্থ্যের উন্নতির আশা করে। যে বার বার সকল কর্ম্মে বিফলমনোরথ হইয়াছে, সে মনে করে আগামী বৎসরে হয়ত তাহার আশা পূর্ণ হইবে। যে শোকে তাপে বড়ই কাতর, সে নববর্ষে শান্তি-লাভের আশা করে। এইরূপে নববর্ষ মানবের মনে আশার বাণী শুনাইয়া তাহাকে উৎসাহের সহিত কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। যদি নববর্ষের আরম্ভ মানবের সম্মুখে এই আশার প্রদীপ না জ্বালিত, তাহা হইলে বোধ হয় মানবের কত আশা, কত উৎসাহ চির দিনের মত অতল জলে ডুবিয়া যাইত। কত প্রাণ অকালে বিনষ্ট হইয়া যাইত, কত জীবন অকর্ম্মণ্য হইয়া সংসার ও জগতের মহা অনিষ্টের হেতু হইয়া উঠিত। আশাই মানবের প্রাণ, আশাই জীবনধারণের একমাত্র উপায়, আশাই একমাত্র সকল কার্য্যের কার্য্যকরী শক্তি। এই আশার বাণী নববর্ষ আমাদিগকে ভাল করিয়া শুনায়। তাই পৃথিবীর সকলে নববর্ষকে এত সমাদরে অভ্যর্থনা করে। যে নববর্ষ আমাদের প্রাণে এইরূপে সকল বিষয়ে শক্তির সঞ্চার করিয়া আমাদিগকে আশায় উৎসাহিত করে, তাহাকে কেনা সর্ব্বান্তঃকরণে আদরের সহিত বরণ করিয়া লইতে ব্যগ্র হয়? এস নববর্ষ! আজ তুমি আমাদের শত নৈরাশ্য, শত দুর্ব্বলতা, সহস্র দুঃখ, তাপ, ও দারিদ্র্য, হৃদয়ভেদী শোকের তীব্র জ্বালা দূর করিয়া দিয়া সান্ত্বনার হস্ত বুলাইয়া ও আশার বাণী শুনাইয়া আমাদের প্রাণে ও জগদ্বাসীর প্রাণে অসীম শক্তির সঞ্চার করিয়া দাও। আজ আমরা আনন্দের সহিত আশাপূর্ণহৃদয়ে তোমাকে বরণ করিতেছি, আমাদের সকলের প্রাণের আশা যেন পূর্ণ হয়।

আজ যেমন এক দিকে তোমাকে আমাদের মধ্যে বরণ করিয়া লইবার জন্য প্রাণ ব্যগ্র হইতেছে, অপর দিকে আবার পুরাতন বর্ষকে বিদায় দিতে প্রাণ তেমনি আকুল হইতেছে। এই পুরাতন বৎসর এক দিন এমনি নূতন রূপ ধারণ করিয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়াছিল, কত আশার বাণী শুনাইয়াছিল, কত আনন্দের মুখ দেখাইয়াছিল, হৃদয়ে কত শান্তি ঢালিয়াছিল, কত সুখের কল্পনায় প্রাণকে মাতাইয়াছিল, কত নব নব ভাব প্রাণে জাগাইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আজ আবার এই বৎসর কত সুখ দুঃখের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া, কত প্রাণপুত্তলিকাকে হরণ করিয়া, কত প্রাণের

সুখ ও শান্তি চিরজীবনের জন্য বিনাশ করিয়া আমাদের নিকট হইতে বিদায় হইতেছে। হে নববর্ষ! তুমি একদিকে যেমন নব আশায় ও নব আকাঙ্খায় প্রাণকে আকৃষ্ট করিতেছ, অপর দিকে পুরাতন সেইরূপ কত সুখ দুঃখের স্মৃতি জাগ্রত করিয়া দিয়া প্রাণকে আকুল করিতেছে। আজ কাহাকে ধরিব, কাহাকে পরিত্যাগ করিব আমাদিগকে এই কঠিন সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে। পুরাতনকে আজ বিদায় দিতেই হইবে। কালের গতি চির-দিনই এই ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে ও তাহা এইরূপই চলিবে। তবে আজ আর বৃথা সময়ক্ষেপ করিয়া তোমাকে ক্লেশ দিব না। নববর্ষ! এস, আজ প্রাণ ভরিয়া তোমাকে বরণ করিয়া লই ও বিশ্বপিতার চরণে প্রাণের আকাঙ্খা নিবেদন করি।

তৃষিত হৃদয়ে নাথ বিতর প্রেম-বারি।
নিবার পাপ, সন্তাপ, দীনদুঃখহারী।
নবপ্রীতি নব আশা জাগাও হে প্রাণে,
সঞ্চার নব শকতি তব কর্ম্মসাধনে।
নাশ সকল বিঘ্ন (তব) কৃপা বিতরি।

শুভ নববর্ষ আগমনে প্রার্থনা।

হে ভবেশ! আজি নব বর্ষ আগমনে,
আসিয়াছি মোরা সবে তোমার চরণে।
ওহে দেব! মোরা অতি দীন দুরবল,
ধৃতিহারা, অবিশ্বাসী, চিত্ত অ-নির্ম্মল,
সংবিদ বিহনে তব শুভ ইচ্ছা নাথ!
বুঝিতে পারি না কিছু, ভ্রমি দিন রাত।
বর্ষ গত শোকে তাপে, বিক্ষিপ্ত হৃদয়,
হইল না কোনও কাজ প্রভু দয়াময়!
যাক সে অতীত, তাহা তুলে কাজ নাই,
নবীন বরষে বিভু! প্রাণে বল চাই।
তোমার মঙ্গল কার্য্য মঙ্গল নিয়ম
সাধিবারে দিও দেব! প্রাণে শক্তি মম।
কি মোরা বলিব আর তব ইচ্ছামত
আমাদের কর নাথ জীবন গঠিত।

শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক,
পানিহাটী—"অক্ষয় কুটীর"।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পার্লামেণ্টের নূতন সভ্য—সার জে, রিজ পার্লামেণ্টের গত নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই, সম্প্রতি উদারনৈতিক সভাপদপ্রার্থী মিঃ ডবসনকে পরাজিত করিয়া তিনি সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

দুর্ঘটনা—চট্টগ্রামের মিউনিসিপাল উদ্যানের মধ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার

যে প্রস্তরনির্ম্মিত অর্দ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা ভূমিসাৎ হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

পঞ্জাবে লোকসংখ্যা গণনার ফল—পঞ্জাবের লোকসংখ্যা গণনায় জানা গিয়াছে যে, তথায় নারী অপেক্ষা পুরুষ ২৫ লক্ষ অধিক। পূর্ব্বে পুরুষ ২২ লক্ষ অধিক ছিল।

জাহাজ নিরুদ্দেশ—সম্প্রতি টাইটানিকনামক একখানি প্রকাণ্ড জাহাজ বরফস্তূপে লাগিয়া জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রায় ১৬ শত লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। সিটি অব গ্লাসগো নামক আর একখানি জাহাজ হ্যালিফক্স হইতে গ্লাসগো যাত্রা করিয়াছিল। তাহাতে ১০০ শত যাত্রী ও ৯৮ জন নাবিক ছিল, কিন্তু সেই জাহাজখানির আর কোনও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, এই জাহাজখানিও বরফস্তূপে লাগিয়া জলমগ্ন হইয়াছে।

পৃথিবীর পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা—জর্ম্মান পণ্ডিত হারগুলিস চ্যাম্বারক গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পৃথিবীতে ১৭০ কোটী লোকের বাস। তন্মধ্যে ১০৩ কোটী ৮০ লক্ষ লোকের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে ৫২,১৭,০০,০০০ জন পুরুষ ও ৫১,৬৩,০০,০০০ জন স্ত্রীলোক। প্রতি সহস্র পুরুষে ৯৯০ জন স্ত্রীলোক। ইউরোপ ও আফ্রিকাতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। প্রতি সহস্র পুরুষে ইউরোপে ১,০২৭ জন ও আফ্রিকাতে ১,০৪৫ জন স্ত্রীলোক। এসিয়াতে প্রতি সহস্র পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯৬১ জন, আমেরিকাতে ৯৬৪ জন ও অষ্ট্রেলিয়াতে ৯৩৭জন। ইউগ্যাণ্ডাতে হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১,৪৬৭, আলাস্কাতে হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কেবল মাত্র ৩৯১ এবং মালয় ষ্টেটে ৩৮৯ জন।

প্রায়শ্চিত্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পর দিন বৈকালে মোহিত ভাবিল "বিমলাবাবু আমাকে যাইতে বলিয়া দিয়াছেন, যাইলে ভাল হয়, কিন্তু আজ থাক্।" মোহিত কিছুক্ষণ বাটীর নিকটস্থ সার্কুলার রোডে বেড়াইয়া সন্ধ্যাকালে বাটী আসিয়া নিজ কক্ষে পড়িতে বসিল। ভৃত্য নিতাই আসিয়া বলিল "আপনার এই চিঠিখানা এসেছে, ছোট বাবু দিলেন।" মোহিত পত্র লইয়া পিতার হস্তাক্ষর দেখিবামাত্র খুলিয়া পাঠ করিল। অন্যান্য সংবাদের শেষে তাহার পিতা লিখিয়াছেন "আমি একটী সুন্দরী সদ্বংশজাতা কন্যা স্থির করিতেছি, ইচ্ছা যে আগামী অগ্রহায়ণ মাসেই তোমার বিবাহ দিব এবং আশা করি যে, তুমি এবার আর আমার

বাক্য লঙ্ঘন করিবে না। তোমাকে অন্নের জন্য কখন চিন্তা করিতে হইবে না, তথাপি কেন যে তোমার বিবাহে অমত, আমি বুঝিতে পারি না, বিবাহ করিলে কি পড়া শুনা হয় না? যাহাই হউক, আমি আশা করি যে, তুমি অন্যান্য বারের মত এবারে আর আমাকে মনঃক্ষুণ্ণ করিবে না।"

মোহিত পত্রখানা বার বার পড়িল, তাহার পর টেবিলের উপরে মাথা রাখিয়া পিতাকে কি লিখিবে ভাবিতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে উত্তর স্থির করিয়া কল্য উত্তর লিখিব ভাবিয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল। কিন্তু সহসা তাহার মনে হইল "না এখনি লিখি।" তখনি মোহিত উঠিয়া পত্র লিখিতে বসিল।

অন্যান্য কথার পরে লিখিল "আপনি এত দিন যখন আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন, তখন আর একটী বৎসর ক্ষমা করিবেন। বি, এল, পরীক্ষাটা দিয়া আপনার আদেশ পালন করিব। আমায় ক্ষমা করিবেন।" তখনি নিতাইকে ডাকিয়া পত্রখানা ডাকে দিতে বলিল। পরে আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া শয্যায় শয়ন করিল। পত্রখানা নিতাই সেই রাত্রিতেই ডাকে দেয় নাই। মোহিত কিন্তু চাকরের হস্তে দিয়া মনে করিল ডাকে দেওয়া হইল, তাই নিশ্চিন্ত মনে শুইল। এ দিকে নিতাইও পত্রখানা বালিশের নীচে রাখিয়া আরামে নিদ্রা গেল।

দুই দিন পরে মোহিত সন্ধ্যাকালে বিমলাচরণ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। চাকর বলিল "বাবু বাড়ী নাই, উপরের ঘরে একটু বসুন, এখনি তিনি আসিবেন।"

মোহিত ভাবিল ফিরিয়া যাই। বলিল "কাল আসব, আমি এসেছিলাম বিমলা বাবুকে বলো"। চাকরটা বাবুর খান্‌সামা, আদব কায়দা অনেকটা জানিত, সে বলিল "একটু বসুন, বাবু এই এলেন বলে।" খান্‌সামা ছাড়িল না, অগ্রে অগ্রে উপরে উঠিল, অগত্যা মোহিতও তাহার সঙ্গে চলিল।

মোহিতকে বিমলাবাবুর বাহিরের কক্ষে বসাইয়া খান্‌সামা বলিল "তামাক ইচ্ছা করবেন কি?" মোহিত একটু হাসিয়া বলিল "না আমি তামাক খাই না।" খান্‌সামা চলিয়া গেল। মোহিত টেবেল হইতে একখানা পুস্তক লইয়া দেখিতে লাগিল।

পশ্চাৎ হইতে একটা অস্ফুট শব্দ শুনিয়া মোহিত ফিরিয়া দেখিল নীরজা। মোহিত হাসিয়া বলিল "নিরো ভয় পেয়েছ নাকি?" নীরজা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, আপনি কখন এলেন?"

"একটু আগে, বিমলা বাবু কখন আস্‌বেন?"

"আর বেশী দেরি নাই। আপনি এতক্ষণ একা বসে আছেন?"

"কি করিব," তারপরে একটু হাসিয়া বলিল "এইতো তুমি এসেছ, একা আর কই?"

নীরজা লজ্জিত হইয়া একটু হাসিয়া

বলিল "বাবার আসৃতে আর বেশী দেরি নাই"। "কিরে নিরো, তোর বাবার কাজ তুই কর্‌ছিস্ না কি"? বলিতে বলিতে বিমলাচরণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"তাহার পর, মোহিত বাবু অনেকক্ষণ এসেছেন নাকি ?"

"আজ্ঞে না, এই একটু আগে।"

"দুদিন আসেন নাই, আমি ভাবিলাম বুঝি ভুলেই গেলেন,"

মোহিত অস্ফুট স্বরে বলিল "পড়িতে হয়, সময় অল্প" ইত্যাদি

নীরজা চলিয়া গেল। বিমলা বাবু মোহিতের সহিত নানাবিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। শেষে নীরজার কথা উঠিল, মোহিত তাহার অপূর্ব্ব দয়ার কথা উল্লেখ করিলে বিমলা বাবু বলিলেন "পড়ায়ও তাহার যথেষ্ট মন, খুব চমৎকার পিয়েনো বাজাইতে পারে" ইত্যাদি। শেষে আনন্দের আধিক্যে বলিলেন "চলুন, আপনাকে তাহার বাজনা শোনাই"।

নীরজা কিন্তু বড়ই বিপদে পড়িল। সে অনেক অপরিচিত লোকের সম্মুখে পিয়েনো বাজাইয়া প্রশংসা লইয়াছে, কিন্তু এই অপরিচিতের চক্ষু তাহাকে বিনা যত্নে এতটা অধিক প্রশংসা দেয় যে, সে তাহা সামলাইয়া উঠিতে পারে না, তাই সে বড়ই গোলে পড়িল। পিতার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে অগত্যা পিয়েনোর কাছে বসিয়া বাজাইল, কিন্তু মোহিত বাবু বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। বিমলা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "মোহিত বাবু, নিরো কেমন বাজাইল ?"

"অতি সুন্দর!"

নীরজার কিন্তু মনে হইল সে আজ ভাল বাজাইতে পারে নাই, আঙ্গুলগুলি আজ তেমন ছুটীতে পারে নাই, তাল আজ তেমন ঠিক হয় নাই, তথাপি মোহিত ভাল বলিল। নীরজা ভাবিল, মোহিত বাবু তাহার অযথা প্রশংসা করিলেন।

সেই দিন হইতে মোহিত প্রায় প্রত্যহই বৈকালে আসিত এবং বিমলা বাবু, নীরজা ও সুরেন্দ্রের সহিত কত গল্প করিত। নীরজার লজ্জার ব্যবধানটা ক্রমে সরিয়া গেল,সে মোহিত বাবুর নিকটে বসিয়া কত দেশের কত গল্প শুনিত, কত সম্বাদ শুনিত, কোন দিন কার্য্যগতিকে না আসিলে অনুযোগ করিত ও না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিত। সুরেন্দ্রও তাহার সহিত খুব মিশিয়া গেল, ক্রমে বিমলাচরণ বাবুও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন। মানবের স্বভাবই এই যে, ঘনিষ্ঠতা হইলেই স্নেহ জন্মে, আত্মীয়তা হইলেই ভালবাসা জন্মে। বিমলাচরণ তাহাকে আপনি ছাড়িয়া তুমি বলা ধরিলেন। ক্রমে গিরিবালা দেবীও মোহিতের সাক্ষাতে বাহির হইতেন, সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতেন এবং কত স্নেহসূচক সম্ভাষণ করিতেন।

তাঁহারা সকলে মিলিয়া মধ্যে মধ্যে ইডেন গার্ডনে বেড়াইতে যাইতেন ও খালের উপর বোটে চড়িয়া বেড়াইতেন।

নীরজা মোহিতের সম্মুখে গান করিত, হার্ম্মোনিয়ম বাজাইত। এইরূপে চারি পাঁচ মাস অতিবাহিত হইয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যাকালে বিমলা বাবু মোহিতকে বলিলেন "মোহিত, তোমাকে আমি একটা গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিব, সেটা বড় গোপনীয় কথা, যার কথা সেও এখনও জানে না"। মোহিত বিস্মিত হইয়া বলিল "কি? বলুন।" একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিমলাচরণ ধীরে ধীরে নীরজার বাল্যজীবনের কাহিনী বিবৃত করিলেন। কিরূপ বয়সে নীরজার বিবাহ হইয়াছিল, কতদিন পরে বিধবা হয়, এবং সে নিতান্ত শিশু বলিয়া তাহার নিকট সে কথা গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে, সমস্ত বলিলেন। মোহিতও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল, তাহার মুখ দিয়া একটীও কথা বাহির হইল না।

"এখন তুমি কি পরামর্শ দাও?"

মোহিত যেন সংজ্ঞা লাভ করিয়া বলিল "কোন্ বিষয়ে পরামর্শের কথা বলছেন?" "আমি মনে করিতেছি তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ দিব। তুমি কি মত দাও?" "বিবাহ দেবেন?" কপালের ঘর্ম্ম মুছিয়া মোহিত বলিলেন "হিন্দু সমাজে এ বিবাহ চল্‌বে কি?" "হিন্দু সমাজ? প্রয়োজন? এক গাছি সূতা এখনও বাপের ভয়ে আছে, যে দিন নীরজার বিবাহ দিব, সে দিন সেই গাছিও ফেলিয়া দিব।"

"এরূপ বিবাহ কি কেহ করিবে?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিমলা বাবু বলিলেন "ভট্টাচার্য্যের তনয় না করিতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ, সুশিক্ষিত পাত্র দুষ্প্রাপ্য হইবে না"।

মোহিতকে বহুক্ষণ নীরব দেখিয়া বিমলাচরণ বলিলেন "তুমিই বেশ বিবেচনা করিয়া দেখ না, এতে কি দোষ? যে বালবিধবা স্বামীর নাম জানে নাই, প্রায় চক্ষেও দেখে নাই, তার বিবাহ দেওয়া কি সাধারণ বিধবাবিবাহের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে? যে সময়ে তার অতি শৈশবকাল, একটা কুসংস্কারের বশে তাহার আত্মীয়রূপী শত্রুতে যদি সেই অজ্ঞানাবস্থায় তাহার বিবাহ দিয়া দেয়, সে স্বামীর মৃত্যু হইলে কি সে বালিকাকে বিধবা বলে? না তাহাকে বিবাহ করিলে পাপ স্পর্শে? স্বামী বলে যখন তার বোধ পর্য্যন্ত জন্মে নাই, কিসের জন্য সে চির-জীবনের বৈধব্যে ব্রতী হইবে?"

বিমলা বাবু মোহিতকে কোন উত্তর দিতে না দেখিয়া বলিলেন "তবে আজ এ প্রসঙ্গ থাক্, অন্য দিন হবে।" মোহিত বলিল "আজ্ঞা হাঁ, আমি আজ আসি।"

"সে কি, তোমার যে আজ এখানে নিমন্ত্রণ? আহার করিয়া যাও।"

"আজ থাক্, কাল হবে।" বলিতে বলিতে মোহিত সত্বর সেই কক্ষ হইতে বাহির হইল।

বিমলা বাবু কিয়ৎক্ষণ বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া রহিলেন। মোহিতের কাছে তিনি এরূপ ভাব আশা করেন নাই।

নীরজা একমনে বসিয়া পড়িতেছিল, পদশব্দে চাহিয়া দেখিল মোহিত চলিয়া যাইতেছে। সে আসিয়া বলিল "মোহিত বাবু, আমার এ অঙ্কটা একটু বুঝিয়ে দিন্ না"। মোহিত স্থিরনেত্রে নীরজার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল "নীরজা বিধবা সত্য, কিন্তু তাহার তাহাতে দোষ কি ?" এ তাহার আত্মীয়দিগের দোষ, তাহার পিতামহের দোষ। সর্ব্বোপরি আমার ভাগ্যের দোষ, তাহার দোষ কি ?"

নীরজা বলিল "বসুন না"। মোহিত বলিল "আজ থাক্ কাল"—

নীরজা হাসিয়া বলিল, "কাল বসবেন? আজ সমস্ত রাতটা বুঝি দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন ?"

"হাঁ,—না, নীরজা—নীরজা, তোমার দোষ কি ?"

দ্বিগুণ হাসিয়া নীরজা বলিল "কি দোষ আমার ? স্বপ্ন দেখ্‌ছেন বুঝি ? বসুন"।

"আজ নয় কাল।" এই বলিয়া মোহিত দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

নীরজা বিস্মিত হইল। অভিমানে তাহার চোখে এক ফোঁটা জলও আসিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

মোহিত সাত আট দিন বিমলাচরণ বাবুর বাটীতে গেল না। এত দিনের মধ্যে সে একটা কথাও স্থির করিতে পারিল না। বিমলা বাবু তাহাকে একটা পরামর্শের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন মাত্র, তথাপি মোহিতের মনে হইতেছিল যে তিনি তাহার মস্তকে এক মহাভার চাপাইয়া দিয়াছেন। নীরজা সুন্দরী, সুশীলা, শিক্ষিতা, ধনীর কন্যা, তাহার বিবাহের জন্য পাত্রের ভাবনা নাই। মোহিত সে ভাবনা ভাবে নাই, সে তাহার নিজের ভাবনা ভাবিতেছিল।

সে কি করিবে? কোন্ পথে চলিবে ? কেহ তাহাকে কোন আশা দেয় নাই, তথাপি সে বহুদিন হইতে যেন কিছু আশা করিয়া বসিয়া আছে। সে এখন তাহা বেশ বুঝিতে পারিল, তাহা না হইলে বিমলাবাবু নীরজার বিবাহের কথা উত্থাপন করাতে তাহার আপনার ভাবনা আসিয়া জুটিবে কেন ? আর মনকে চোখ্ ঠিপিলে চলিবে না, জীবনের সমস্ত গতিটা ভাল করিয়া বুঝিয়া একটা পথ ধরিয়া চলিতে হইবে। মোহিত নিজে বুঝিতেছে যে, বিমলাবাবুর এ বিবাহ দেওয়া কিছুই অন্যায় নয়, নীরজারও ইহাতে কোন পাপ নাই, সে স্বামীর কিছুই জানে না। যে তাহাকে বিবাহ করিবে, সেও সৌভাগ্যশালী, তবু তাহার মনের মধ্যে পিতার মলিন মুখ, সমাজ, বিষম জাগিতেছিল। মোহিত অস্থির হইয়া উঠিল।

আবার হৃদয়ের কোণ হইতে ধীরে ধীরে একখানি জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আঁধার আকাশের গায়ে চন্দ্রের ন্যায় উদয় হইল, তাহার আলোকে সমস্ত অন্ধকার দূরে পলাইয়া গেল। এ মূর্ত্তির

কাছে বুঝি আর সমস্ত কিছুই নয়। পিতার অসন্তোষ, সমাজ, নিন্দা, অর্থ, কলহ, সমস্ত এক কোণে ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাকার হইয়া গেল, মোহিত উঠিয়া বসিল।

নীরজা এ কয় দিন মনে মনে খুব রাগ করিয়া রহিল। "মোহিত বাবু আসিলে আর কথা কহিব না, পিয়ানো বাজাইব না, গান গাহিব না"। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, তত রাগটাও মন হইতে একটু একটু করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। মোহিত বাবু সাত আট দিন আসিলেন না, অসুখ হয় নাই তো? নীরজার রাগ ভয়ে পরিণত হইল। সে সুরেন্দ্রকে খোঁজ লইতে বলিল। সুরেন্দ্র বলিল "আজ রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ভাল আছেন, বল্লেন কাল যাব।" নীরজা আশা করিয়া রহিল "কাল নিশ্চয় আসিবেন।"

কল্য আসিল এবং চলিয়া গেল। মোহিত আসিল না। নীরজার মনে আবার তাহার উপর অভিমান হইল। তখন তাহার মনে হইল "আমার উপর রাগ করেন নাই তো"। তারপরে মনে পড়িল, সে দিন তিনি কি দোষের কথা বলিতেছিলেন, "হয়ত আমি কোন দোষ করেছি"। নীরজা ব্যাকুলা হইল।

কয়েক দিন পরে মোহিত আসিয়া ধীরে ধীরে একখানি চেয়ারে বসিল। নীরজা অলক্ষ্যে চাহিয়া দেখিল, বেশ প্রফুল্ল মুখ, স্নেহোৎফুল্ল নয়ন, শরীরে কোন গ্লানির চিহ্ন নাই, তখন গম্ভীর মুখে নীরজা রাগ করিয়া রহিল। মোহিত তাহার অভিমান বুঝিতে পারিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে কহিল "নিরো, রাগ করেছ বুঝি? এতদিন আমার মনটা বড় খারাপ ছিল, তাই আস্‌তে পারি নাই।" নিরজা দেখিল হাস্যপূর্ণ মুখ, তবুও চোখের কোণে কে যেন কালী ঢালিয়া দিয়াছে। নীরজা বলিল "মন খারাপ ছিল, কোনো অসুখ করেছিল কি?" মোহিত পূর্ব্বের মত হাসিয়া বলিল "নিরো! অসুখ না হ'লে বুঝি মন খারাপ হয় না?" "তা হয়, তবে আপনার মন খারাপ হয়েছিল কেন, মোহিত বাবু?"

"তুমি শুনে কি কর্‌বে?"

"শুনে আবার কি ক'রব, এমনি শুন্‌ব, বল্‌বেন না?"

মোহিত কম্পিতকণ্ঠে বলিল "আজ থাক্, আর এক দিন বল্‌ব।"

"সে দিন কি বল্‌ছিলেন 'নীরজা তোমার দোষ কি?' সে কথাটাও বল্‌বেন না?"

"এক দিন ব'ল্‌ব, তবে আজ নয়, নিশ্চয় ব'ল্‌ব, রাগ করো না নিরো"।

নীরজা রাগ করিত, কিন্তু মোহিতের সস্নেহ স্বরে রাগটা তেমন যোগাইল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

সর্ব্বানন্দদায়িনী।

মাতৃরূপা নারী তুমি দুর্ল্লভ জগতে
ভারত পবিত্র গেহে কর অধিষ্ঠান।
ভগিনীরূপিণী তুমি ধন্য এ মহীতে
ভুলিতে পারে কে তব স্নেহের সে দান?
পত্নীরূপে হে রমণি! বিরাজিত যবে,
প্রেমের কিরণে দীপ্ত আঁধার সংসার।
ল'ভে নিরমল শান্তি অশান্তমানবে,
দুহিতৃরূপেতে তুমি প্রীতিপ্রদায়িনী,
শান্তি, সুখ, দাও যবে আনন্দদায়িনি!

পানিহাটী "অক্ষয়কুটীর,"
শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক।

৺ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মজীবনী।

অনুসন্ধানে জানা গেল স্কুলসমূহের ডেঃ ইনস্পেক্টর জগৎ বাবুর পুত্র পুলিসের ইনস্পেক্টর। জগৎ বাবু আমাকে খুব স্নেহ করিতেন এবং আমাদিগের কার্য্যে তাঁহার অত্যন্ত সহানুভূতি ছিল। তিনি পুত্রকে ডাকাইয়া আমাকে তাঁহার পরিচিত করিয়া দিলেন এবং আমাদিগকে সহায়তা করিতে বিশেষ করিয়া বলিলেন। পূর্ণ বাবু এক দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া আমাদিগকে হরিনাভিতে থাকিতে বলিলেন এবং সেই দিন তিনি ইনস্পেক্‌শনে আসিবেন জানাইলেন। আমরা সেই দিন আসিয়া দেখি গ্রামে হুলস্থুল পড়িয়াছে এবং জমীদারের লোক ও পুলিসের লোক এথায় সেথায় দলবদ্ধ রহিয়াছে।

গ্রামের সব লোকের জমীদারের রায়ে রায়, স্থানীয় পুলিসও উৎকোচ দ্বারা বশীভূত, ইনস্পেক্টরের এজাহারে সকলেই বলিল—ব্রাহ্মসমাজ ত এখানে কখনও ছিল না, এ গৃহ পাড়ার রক্ষাকালী পূজার গৃহ।

ইনস্পেক্টর উভয় পক্ষের জবানবন্দী লইয়া পুলিসের উপর খুব শাসাইয়া গেলেন। পরে আমরা সাক্ষাৎ করিলে বলিলেন, দেখ আমি সকলই বুঝিতেছি। কিন্তু যাহার দখল আছে, তাহা রক্ষা করাই আমাদের কার্য্য, আমরা স্বত্বাস্বত্ব মীমাংসা করিতে পারি না। আপনারা মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করুন, আমি যতদূর সাধ্য সহায়তা করিব। আর যাহারা আপনাদের ধর্ম্মে আঘাত করিয়াছে, তাহারা সহজে এড়াইতে পারিবে না।

আমাদের না আছে সহায়, না আছে সম্বল। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার কার্য্যে লাগিলাম। আদালতে ২।১টী বন্ধুও পাইলাম। যাঁহাদের নাম আসামী-

শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল, তাঁহাদের নামে সমন গেল।

নালিসের পূর্ব্বে গ্রামে মহা জনরব হইয়াছিল যে আমরা গ্রামে পদার্পণ করিলে প্রহারিত হইব, মাথা কাটা যাইবে। মোকর্দ্দমার দিন আদালতে গিয়া দেখি জমীদারের সহিত গ্রামের প্রধান প্রধান লোক সেখানে উপস্থিত। জমীদার আমাকে দেখিবামাত্র হাত যোড় করিয়া বলিলেন "আপনি রক্ষা করেন ত রক্ষা—আপনাকে রক্ষা করিতেই হইবে"। আমি এ অবস্থা দেখিয়া কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না। আমি বলিলাম "আপনাদের কোনও অনিষ্ট হয় সে ইচ্ছা আমার কিছুমাত্র নাই। আমরা নিরাশ্রয় গরিব লোক—একটী ঈশ্বরোপাসনার স্থান করিয়াছি, আপনারা তাহাতে কেন হস্তা হন। তাহাতে আমাদের উপাসনা করিতে দিলেই সব গোল মিটিয়া যায়। জমীদার তখন আমার অনেক গুণস্তুতি করিয়া বলিলেন "দেখুন আপনি সব বুঝেনত, আপনারা যে স্থানে উপাসনার স্থান করিয়াছেন সে পাড়ার মধ্যস্থলে, মেয়েরাও তাহার চারি দিকে যায় আসে। আমি গ্রামের প্রান্তে এক খণ্ড জমী মৌরসী পাট্টা করিয়া আপনাকে দিতেছি, তথায় উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণ করুন। আর যত দিন গৃহ না হয়, তত দিন আমার উদ্যানবাটী আপনাদের অধিকারে থাকিবে, আপনারা স্বচ্ছন্দে আসিয়া তথায় উপাসনাদি করিবেন। আমি আপনাদের উপাসনার পক্ষ বই বিপক্ষ নহি।" এই বলিয়া তিনি নালিশ তুলিয়া লইবার জন্য কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। জমীদার যে কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা আগে বুঝেন নাই, পরে উকীলদের মত লইয়া বুঝিয়াছিলেন যে ধর্ম্মবিদ্বেষীর কার্য্যের অতি গুরুতর দণ্ড, তাহাতেই ভয় পাইয়াছিলেন।

আমরা যখন বলিলাম "আমাদের নিজের একটু স্থান পাওয়াই আবশ্যক। তাহা কবে কিরূপে হইবে? তাহা না হইলেত মোকর্দ্দমা তুলিতে পারি না।" তিনি বলিলেন "এখানে ইহার সব প্রস্তুত"। এই বলিয়া কেদার বাবুর খুড়া ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা তাঁহাদের একখানি জমীর পাট্টা লেখাইলেন এবং সেইখানেই তাহা রেজিষ্টারী হইল। আমরা মোকর্দ্দমা তুলিয়া লইলাম জমীদার স্বদলে আমাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

মার্সি মারভিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ডিসেম্বর মাস, ভীষণ শীত, সমস্ত দিন তুষারপাতে লণ্ডনের রাজপথ অতিশয় কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। যেন সমস্ত লণ্ডন

নগরী ঘন কুয়াষার আবরণে বিষণ্ণ ও মলিন হইয়াছে। সেদিন অন্য দিন অপেক্ষা সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মারসি কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অন্য কোন বিষয়ে মনোনিবেশ না করিয়া এক বাতায়ন সন্নিধানে উপবেশন করিয়া একখানি পুস্তকপাঠে রত হইল। সে দিন অন্য দিন অপেক্ষা তাহার মন কেন অধিকতররূপে নিস্তেজ ও দুর্ভাবনাগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, মারসি নিজেই তাহা বুঝিতে পারিল না। সে পুস্তকপাঠে মনোনিবেশ করিয়া মানসিক অবসাদ দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এ দিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিলে যখন লণ্ডনের রাজপথ বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত হইল, তখন সোপানশ্রেণীতে কাহার দ্রুতপদবিক্ষেপ ধ্বনি ধ্বনিত হইল। পরক্ষণেই কে একজন মারসির গৃহের দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। বাটীর চাকরাণী কোন কার্য্যহেতু গৃহে প্রবেশ প্রার্থনা করিতেছে ভাবিয়া অন্যমনস্কভাবে মারসি বলিল—

"ভিতরে আইস"। মারসির এই কথা উচ্চারিত হইবামাত্র সহসা দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। লর্ড মারভিল স্বয়ং মারসির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মারসি লর্ড মারভিলকে সহসা সম্মুখে দর্শন করিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে অর্দ্ধমূর্চ্ছিতাবস্থায় চীৎকার করিয়া বলিল—

"ষ্টিফেন, ষ্টিফেন। এ কি? এ! তুমি?"

লর্ড মারভিল স্নেহপূর্ণ স্বরে উত্তর করিলেন—

"হাঁ, প্রিয়তম মারসি, আমি তোমার নিকটে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছি"।

এই কথা বলিয়া লর্ড মারভিল কিছুক্ষণ নীরবে মারসির সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। মারসিও কিছুক্ষণ একটিও কথা কহিতে পারিল না। গভীর আনন্দে উভয়ের হৃদয় সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। অবশেষে মারসি আর নীরব থাকিতে না পারিয়া কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ষ্টিফেন, ষ্টিফেন, তুমি কি বিবাহিত হইয়াছ?"

লর্ড মারভিল উত্তর করিলেন—

"না। প্রিয়তম মারসি, আমি আজিও বিবাহিত হই নাই। অধিকন্তু এলোইস আমাকে বাগ্দান-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছে। মারসি, মারসি, আমাকে ভর্ৎসনা করিও না। কারণ তুমি ভর্ৎসনার ভাবে ভ্রুকুটি করিতেছ। আমি স্বয়ং আমাদের বাগ্দান-বন্ধন ভঙ্গ করি নাই। এলোইস স্বয়ং ইহা ভঙ্গ করিয়াছে। যেই মাত্র এলোইস আমাকে বাগ্দান-বন্ধন হইতে মুক্ত করিল, সেই মুহূর্ত্তে আমি তোমার নিকট দৌড়িয়া আসিয়াছি। এক্ষণে বল প্রিয় মারসি, তুমি আমাকে কবে বিবাহ করিবে?"

লর্ড মারভিল এই কথা বলিয়া মারসির মনের কথা জানিবার জন্য তাহার নয়নের

প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। মারসি সলজ্জভাবে উত্তর করিলেন—

"ষ্টিফেন, যে দিন তুমি বলিবে; সেই দিনই আমি তোমাকে বিবাহ করিব। কিন্তু এরূপ শুভ সংবাদ সহসা বিশ্বাস হইতেছে না। আমি সম্পূর্ণ বিস্মিত হইয়া গিয়াছি"।

লর্ড মারভিল বলিলেন—

"তোমাকে অত্যন্ত শীর্ণ দেখাইতেছে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আমি তোমার ম্লান গণ্ডদেশে লোহিত গোলাপ ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইব"। মারসি বলিল—

"ষ্টিফেন, কিন্তু আমি কিছুই ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছি না। কেন এলোইস তোমাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইল? কেন সে তোমাকে বাগ্দান-বন্ধন হইতে মুক্ত করিল? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না"।

লর্ড মারভিল মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—

"সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিলে তোমারও মন বদলাইয়া যাইবে। আমি আর লর্ড উপাধিধারী ব্যক্তি নাই। আমি লর্ড উপাধি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। বল, প্রিয় মারসি আমি আর লর্ড উপাধিধারী ব্যক্তি নহি, সেজন্য কি আমি তোমারও প্রেমলাভে বঞ্চিত হইব?"

"মারসি উত্তর করিল—

আমি শুনিয়া সুখী হইলাম যে, তুমি এক্ষণে আর লর্ড উপাধিধারী নহ। তোমার লর্ড বন্ধুরা আর বলিতে পারিবেন না যে, তুমি উচ্চ শ্রেণীস্থ লোক হইয়া একজন সামান্য নগণ্য বালিকাকে বিবাহ করিয়াছ। এক্ষণে আমরা দুই জনেই সামান্য লোক।"

(ক্রমশঃ)

মহাসমুদ্রে দুর্ঘটনা।

জাহাজ ভঙ্গ।

১৫৯৫ জন আরোহী জলমগ্ন।

কয়েক মাস হইল, ইংলণ্ডে "টাইটানিক" নামক একখানা জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী মেরী এই জাহাজ ভাসান ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। তখন এই জাহাজের নির্ম্মাণপ্রণালী দেখিয়া লোকে বলিয়াছিল, "শোলা জলে ডুবিতে পারে, কিন্তু এই জাহাজ কখনও ডুবিতে পারে না।" বিগত ১০ই এপ্রিল বুধবার এই জাহাজ ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা অভিমুখে প্রথম যাত্রা করে, এবং ১৫ই রাত্রিকালে আটলাণ্টিক মহাসাগরে ভাসমান বরফ-স্তূপের সংঘর্ষণে ইহা খোলার কুচির ন্যায় ডুবিয়া যায়। মানুষের গর্ব্বের এই মূল্য।

মানুষের বুদ্ধিতে যাহা হইতে পারে তাহা সমস্তই করা হইয়াছিল। জাহাজখানা ৫৮৮ হাত দীর্ঘ ও ৬১ হাত প্রশস্ত, যাত্রী ও মাল্লাতে ৩৫০০ জন লোক এই জাহাজে বাস করিতে পারিত। প্রথম শ্রেণীর ৫৫০, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৪০০ ও তৃতীয় শ্রেণীর ৫০০ যাত্রী একই সময়ে আহারে বসিতে পারিতেন, জাহাজে এমন স্থান ছিল। জাহাজের এক তলা ও দুই তলাতে ভ্রমণের দুই মাইল দীর্ঘ পথ ছিল। যে কোন যাত্রী অবাধে এই দুই মাইল পথ ভ্রমণ করিতে পারিতেন। জাহাজের মধ্যে ব্যায়াম করিবার জন্য এক বৃহৎ ঘর ছিল। এই ঘরে ব্যায়ামের উপযোগী সর্ব্ব প্রকার সরঞ্জাম ছিল। এতদ্ব্যতীত স্কোয়াস খেলিবার জন্য আর এক ঘর ছিল। জাহাজের মধ্যে স্নানের বিবিধ বন্দোবস্ত ছিল। কেহ টারকিস স্নান, কেহ তাড়িত স্নান, কেহ বা সন্তরণের পর স্নান করিতেন। সন্তরণের জন্য জাহাজের মধ্যে এক সরোবর ছিল। টারকিস স্নানের জন্য উষ্ণ ও শীতল জলের ভিন্ন ভিন্ন জলাধার ছিল। এই স্থানে পরম রমণীয় মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রস্রবণ হইতে অবিরত জলধারা পতিত হইত।

স্নানান্তে যাত্রিগণ আহার-গৃহে যাইতেন। সে ঘর বৃহৎ, সুন্দর, ও নানা সাজ সজ্জায় অলঙ্কৃত।

ভূমণ্ডলের যথায় যত উৎকৃষ্ট ফল ও অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্য পাওয়া যায়, সমস্তই যাত্রীদের জন্য সংগৃহীত হইত। আহারের পর অনেক যাত্রী তামাক সেবনের গৃহে প্রবেশ করিতেন। সে ঘর মেহগিনি কাষ্ঠে নির্ম্মিত। ইহার পর যাত্রিদল জাহাজের বারন্দায় যাইয়া সমুদ্রের অনন্ত নীলাম্বুর শোভা সম্ভোগ করিতেন। বারান্দার রেলিং নানাজাতীয় সুন্দর লতায় আচ্ছাদিত। তাহাতে কেমন সুন্দর ফুল ফুটিয়া থাকিত।

ইহার পর যাত্রীরা বৃহৎ বৈঠকখানায় যাইয়া পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন।

যাত্রীদের জন্য পড়িবার ও লিখিবার ঘর ছিল, পাঠগৃহে কত পুস্তক, কত সংবাদ-পত্র ছিল। বিনা তারে পৃথিবীর নানা দেশের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া জাহাজের মধ্যে সংবাদপত্র প্রকাশ করা হইত। পাঠের ও লিখিবার ঘরে বড় বড় জানালা ছিল, সে জানালার মধ্য দিয়া নীলাম্বুর গম্ভীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিত।

জাহাজের শয়ন, দরবার ও পোষাক ঘর প্রভৃতি পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয়। যে দেশের যাহা উৎকৃষ্ট, তাহারই অনুকরণে এই সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। জাহাজের মধ্যে গৃহের সুখ সম্ভোগ আর কোথাও সম্ভব ছিল না। মানুষ ভাবিয়াছিল, তাহার জ্ঞান বুদ্ধিকে কেহ পরাস্ত করিতে পারিবে না। রাত্রি ১০ টার সময় এই ভীমকায় অদ্বিতীয় জাহাজের তলদেশে বরফস্তূপের সংঘর্ষণ হয়, আর রাত্রি

২টার সময় আটলাণ্টিক মহাসাগরের বারিরাশির তলে ১৫৯৫ জন যাত্রী ও নাবিক সহ জাহাজখানি নিমজ্জিত হয়। এমন বৃহৎ, এমন দ্রুতগামী, এমন সুখৈশ্বর্য্যপূর্ণ জাহাজ ভূমণ্ডলে আর হয় নাই। আশা ছিল ১৭ই তারিখ এই জাহাজ আমেরিকায় পঁহুছিবে, কিন্তু ১৫ই তারিখেই জলমগ্ন হইল।

স্থান ও সময়ের দূরত্ব দূর করিবার জন্য জগন্ময় এক মহা আকুলতা দেখা যাইতেছে। তাই স্থলে রাস্তা, রেল পথ প্রভৃতি, জলপথে অসংখ্য অর্ণবযান এবং আকাশমার্গে বায়ুযান নির্ম্মিত হইতেছে। ইউরোপ এবং আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, কিন্তু এই দুই মহাদেশের মধ্যে এক বিশাল মহাসমুদ্র থাকায় পরস্পরের মধ্যে অনেক ব্যবধান রহিয়াছে। এই ব্যবধান এবং দূরত্ব হ্রাস করিবার জন্য প্রতিনিয়ত কত নূতন নূতন উন্নত প্রণালীর জাহাজ প্রস্তুত হইতেছে এবং নূতন নূতন জলপথও আবিষ্কৃত হইতেছে। সকলেরই প্রাণপণ চেষ্টা এই যে, কাহার জাহাজ সর্ব্বাগ্রে যাইতে পারে। বৎসরের মধ্যে এপ্রিল মে ও জুন এই তিন মাসে অর্থাৎ বসন্তকালে ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক লোক দেশভ্রমণে বহির্গত হন, এবং এই সময় দ্রুতগামী জাহাজ সকল শীঘ্র যাইবার জন্য আটলাণ্টিকের উত্তর প্রান্তের পথ দিয়া যাতায়াত করে। উত্তর মেরুতে যে সকল বরফ পুঞ্জীভূত হয়, সেই সকল বরফস্তূপ এই সময় ভাঙ্গিয়া উত্তর মহাসাগরে পতিত হয় এবং ক্রমশঃ দক্ষিণ দিগে ভাসিয়া গিয়া অবশেষে উষ্ণ মণ্ডলে উপনীত হয় ও তথায় গলিয়া যায়।

গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে টাইট্যানিক যখন প্রথম বাহির হইয়া সাউথাম্‌টনের বন্দরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সহস্র সহস্র লোক এই জাহাজ দেখিবার জন্য তীরে সমবেত হইয়াছিল। কে তখন জানিত যে ঠিক এক পক্ষ পরেই এত বড় জাহাজ পৃথিবীর এতগুলি ধন-কুবেরকে বক্ষে ধারণ করিয়া আটলাণ্টিকের মধ্যে চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হইয়া যাইবে?

টাইট্যানিক্‌ বন্দরে আসিলে ইউরোপ ও আমেরিকার বহুসংখ্যক লোক এই জাহাজে চড়িয়া আমেরিকা বেড়াইয়া আসিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। আমেরিকার বহু ধনকুবের ত অনেক আগে হইতেই এই জাহাজে চড়িয়া বাড়ী যাইবার জন্য ইংলণ্ডে বসিয়াছিলেন। সকলেরই প্রাণের ইচ্ছা এই যে, পৃথিবীর এই অদ্বিতীয় জাহাজের প্রথম যাত্রাতেই তাঁহারা তাহাতে আরোহণ করেন। এই আত্মপ্রসাদের জন্য বহু লোক এই জাহাজের যাত্রী হইয়াছিলেন। বসন্তকালে আটলাণ্টিক মহাসাগরের উত্তর দিয়া সকল প্রসিদ্ধ যাত্রী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে। ডাঙ্গায় যেমন কাহার ঘোড়া আগে যাইতে পারে ইহা লইয়া ঘোড়দৌড় হয়, সেইরূপ আটলাণ্টিক মহাসাগরেও এই সময় অনেক প্রসিদ্ধ কোম্পানীর জাহাজসমূহের মধ্যে রীতিমত "দৌড় বাজী" লাগিয়া যায়। যে সকল

প্রসিদ্ধ জাহাজ কোম্পানী এই দৌড় বাজীতে পাল্লা দিয়া থাকেন, তাহাদিগের মধ্যে "কানার্ড," "হোয়াইট ষ্টার" এবং "হামবার্গ আমেরিকা লাইন"ই প্রধান। ইঁহাদিগের প্রত্যেকেরই এই পথের জন্য দুই খানা করিয়া জাহাজ আছে—কিন্তু হোয়াইট ষ্টারের অলিম্পিক্ ও টাইট্যানিক সকলকে পরাস্ত করিয়াছে। এবার টাইট্যানিকের বৃত্তান্ত পড়িয়া সকলেই এই জাহাজে যাত্রা হইয়া চলিয়াছিলেন। হোয়াইট ষ্টার লাইনের চেয়ারম্যান মিঃ ইস্‌মেও স্বয়ং এই প্রথম যাত্রায় এই জাহাজে যাত্রী ছিলেন। তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া জাহাজের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। সকলেই মনের আনন্দে ইন্দ্রপুরী সদৃশ এই বিশাল জাহাজে নিউইয়র্কের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কেহই কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, ভবিতব্য তাঁহাদিগের জন্য কি ভীষণ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইংলণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের সীমা ছাড়াইয়া আটলান্টিকের মধ্য দিয়া ক্রমে জাহাজ উত্তর পথ দিয়া যাইতে লাগিল। এ পর্য্যন্ত কখনও এ পথে কোনও বিপদ হয় নাই বলিয়া কাহারও প্রাণে বিপদের কোন চিন্তারও উদ্রেক হয় নাই। তাহা ছাড়া আকাশে কোনও দুর্যোগের লক্ষণ ছিল না। নক্ষত্রশোভিত আকাশের নীচে মহা-সাগরের জলরাশি একখানা নীল বসনের ন্যায় পড়িয়াছিল। প্রকৃতিতে প্রলয়ের কোন চিহ্ন ত দূরের কথা, কোথায়ও একটু প্রবল বায়ু পর্য্যন্ত ছিল না। সমুদ্রের বিশাল বক্ষ নীরব, নিস্পন্দ, স্থির, কোথায়ও উর্ম্মির লেশ ছিল না। একজন যাত্রী বলিয়াছেন যে, ঠিক পুকুরের জলের ন্যায় সমুদ্রের বারিরাশি নির্বাত নিষ্কম্প হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর মাথার উপর অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া অগণ্য তারকা-রাজি যেন দীপমালা জ্বালিয়া রাখিয়াছিল। এমতাবস্থায় কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, তাহাদিগের আসন্ন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। রাত্রির আহারাদির পরে যাত্রীদিগের অনেকেই যে যাহার কক্ষে চলিয়া গিয়াছিলেন, কেহবা ধূমপান-কক্ষে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন, কেহ কেহ বা দল বাঁধিয়া তাস খেলিতেছিলেন, কেহ কেহ বা সঙ্গীতে নিযুক্ত ছিলেন। এইরূপে সকলেই আপন আপন ইচ্ছানুযায়ী আমোদে কাল কাটাইতেছিলেন। এদিকে জাহাজ দ্রুতবেগে নীলাম্বুরাশি ভেদ করিয়া আপনার গন্তব্য পথে চলিতেছিল। মিঃ ইস্‌মে ও জাহাজের কাপ্তেন মিঃ স্মিথ্ পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, ১৭ই এপ্রিল রাত্রিকালে তাঁহারা নিউইয়র্কে জাহাজ পৌছাইয়া দিবেন, এইজন্যই জাহাজ খুব দ্রুতগতিতে চলিতেছিল। আকস্মিক বিপদ হইতে পারে, একথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। যাহা হউক জাহাজ চলিতে চলিতে রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় হঠাৎ কিসে যেন একটু ধাক্কা লাগিল। যাত্রীরা সকলেই প্রায় তখন জাগিয়াছিলেন, কিন্তু ধাক্কা এত মৃদু

বোধ হইল যে কেহ তাহা অনুভবই করিতে পারেন নাই। তাহার পরমুহূর্ত্তেই আবার একটা ধাক্কা একটু জোরে লাগিল। এবারও অনেকে মনে করিলেন যে হয়ত ভাসমান বরফস্তূপের সহিত জাহাজের সংঘর্ষণ হইয়াছে এবং ইহা বিপদজনক নহে মনে করিয়া কেহ কোন শঙ্কা করিলেন না। কিন্তু ইহার প্রায় দশমিনিট পরে হঠাৎ জাহাজের ইঞ্জিন প্রভৃতি সব বন্ধ হইয়া গেল। তখন যাত্রীদিগের মধ্যে মিঃ বার্ড নামক জনৈক ভদ্রলোক ব্যাপার কি জানিবার জন্য উপরে গেলেন। বলা বাহুল্য, তিনি তখন কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে তাঁহাদিগের অন্তিমকাল উপস্থিত। চলিতে চলিতে হঠাৎ জাহাজের গতিরোধ হওয়ায় তিনি ভাবিলেন যে নিশ্চয়ই কোনও গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই জন্যই জাহাজ চলা বন্ধ হইয়াছে। মিঃ বার্ড তখন কৌতূহল পরবশ হইয়া প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য তাড়াতাড়ি ক্যাবিন হইতে বাহির হইয়া জাহাজের উপরিভাগে গেলেন, কিন্তু কোথায়ও কোন প্রকার জনতা বা আতঙ্কের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তিনি কেবল দেখিলেন যে জাহাজের ডেকের উপর কাপ্তেন ও নাবিকগণ মিলিয়া জটলা করিতেছে, বাহিরে আকাশ ও জল, কোথায়ও কোন চাঞ্চল্যের চিহ্ন নাই, কেবল জাহাজের দুই পার্শ্বে বরফস্তূপ ভাসিয়া যাইতেছে। তাই দেখিয়া মিঃ বার্ড ভাবিলেন যে হয়ত এই বরফস্তূপের সহিত জাহাজের সংঘর্ষণ হওয়ায় কাপ্তেন সতর্কতা অবলম্বন করিবার জন্য জাহাজ থামাইয়া দিয়াছেন। এই মনে করিয়া তিনি পুনরায় আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময় অন্য কোনও যাত্রীর সহিত তাঁহার দেখা হইল না, সকলে মনের আনন্দে যে যার ঘরে আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন। একদল লোক খেলিবার ঘরে বসিয়া তাস খেলিতে ছিলেন, মিঃ বার্ড তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কিছু জানেন কি, জাহাজ হঠাৎ থামিল কেন?" তাহারা খেলিতে খেলিতেই উত্তর করিল "কি জানি কেন থামিল, আমরা কেবল একটু ধাক্কা টের পাইয়াছি।" মার কোলে শিশু যেমন আপনাকে নিরাপদ মনে করে জাহাজের সকলেই আপনাদিগকে তেমনি নিরাপদ মনে করিতেছিলেন। মিঃ বার্ড সব দেখিয়া শুনিয়া নিজের ক্যাবিনে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই জাহাজে বিপদের ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়া উঠিল। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইলে মানুষ যেমন স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া যায়, জাহাজের যাত্রিগণ হঠাৎ এই ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। আর একটু পরেই কাপ্তেনের গম্ভীর স্বর শুনা গেল। তিনি বলিলেন—"যাত্রিগণ! জীবন বাঁচাইবার কোমর বন্ধ পরিয়া ডেকের উপরে এস।" তখন যে যেখানে যে ভাবে ছিল সকলেই লাইফ বেল্ট পরিয়া কাপ্তেনের আদেশ মত

জাহাজের ডেকে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সকলে বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারা কি বিষম বিপদে পতিত হইয়াছেন। বরফস্তূপের সহিত জাহাজের সংঘর্ষণ হওয়ায় তাহার তলদেশ ফাটিয়া গিয়াছে এবং সেইখান হইতে হু হু শব্দে জল জাহাজে প্রবেশ করিতেছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বর্ত্তমান সময়ে এমন সকল কল আবিষ্কৃত হইয়াছে যে জাহাজের তলদেশ ফাটিয়া গেলেও জাহাজের কামরাগুলির মধ্যে কোনমতেই জল প্রবেশ করিতে পারে না। টাইটানিক জাহাজেরও এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থার ফলে জাহাজ কোনমতেই সমুদ্রে ডুবিতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই জাহাজের তলদেশে জল প্রবেশ করিয়া সেই শীতল জল ইঞ্জিনের বয়লারের সংস্পর্শে আসাতে সমুদয় বয়লার ও টারবাইনগুলি ফাটিয়া গেল এবং তাহার ফলে জাহাজ খানি দুই খণ্ড হইয়া গেল। তখন আর জলের গতিরোধ করে কাহার সাধ্য? এই ভীষণ অবস্থা উপলব্ধি করিবা মাত্র কাপ্তেন বিপদের ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন এবং মুহূর্ত্তমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া বিপন্ন যাত্রীদিগের প্রাণ বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মার্কনি যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রের চারিদিকে বিনাতারে আপনাদিগের বিপন্ন অবস্থার সংবাদ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। বিপদের সময় মানুষের জাতীয় চরিত্রের শিক্ষা এবং মহত্বের পরিচয় পাইবার যেমন সুযোগ ও সুবিধা হইয়া থাকে, এমন আর কোন অবস্থাতেই হয় না। এই ভীষণ বিপদের সময় টাইটানিকের নাবিক, কাপ্তেন এবং কর্ম্মচারীগণ যে অমানুষিক বীরত্ব, সাহস, ধীরতা এবং নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে চিরকাল তাহা স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। কাপ্তেন স্মিথ যখন বুঝিলেন যে আর কিছুতেই জাহাজ রক্ষা হইবার উপায় নাই এবং কখন সাহায্য উপস্থিত হইবে এবং হয় ত হইবে কি না তাহারও কোন ঠিকানা নাই, তখন তিনি নিমেষের মধ্যে আপনার কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া লইলেন এবং সকলের আগে স্থির করিলেন যে নিজের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যিনি নিজের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়া আপনার দায়ীত্ব এবং কর্ত্তব্য ধীর ও স্থির চিত্তে সম্পাদন করিতে পারেন, তিনি সকলের পূজ্য ও নমস্য। শুধু কি কাপ্তেন স্মিথ এইরূপ করিয়াছিলেন? তাঁহার জাহাজের অশিক্ষিত নাবিকেরা পর্যান্ত যে সাহস এবং বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

জাহাজের এই বিপন্ন অবস্থার কথা মার্কনি যন্ত্রের সাহায্যে চারিদিকে পাঠান হইতে লাগিল এবং জাহাজ হইতে ঘন ঘন হাউই ছোঁড়া হইতে লাগিল। আশা এই যে, যদি কোনও সমুদ্রগামী জাহাজ এই সংবাদ পায় অথবা হাউই দেখিতে পায়, তাহা হইলে উহা উদ্ধার করিতে

আসিবে। এদিকে জাহাজের মধ্যে প্রবল বেগে জল উঠিতে আরম্ভ করিল। তখন জাহাজের ডেক সমুদ্র হইতে ৪৬ হাত উচ্চ ছিল, কাপ্তেন নাবিকদিগকে এক এক করিয়া জলিবোটগুলি নামাইতে বলিলেন। জাহাজে যাত্রী ও নাবিক সর্ব্বশুদ্ধ ২৩৪০ জন লোক ছিল, কিন্তু যে পরিমাণ বোট ছিল তাহাতে ৯০০ শত জনের অধিক লোক ধরিবার স্থান ছিল না, সুতরাং ইহা স্থির হইল যে সকলের প্রাণ রক্ষা হইবে না। এই সময় কি ভয়ানক! এখন আরোহীদের মধ্যে কে মরিবে আর কাহাকে বাঁচিতে দেওয়া হইবে, তাহা স্থির করিতে হইবে। ২৩৪০ জন লোকের মধ্যে কেবলমাত্র ৯০০ শত লোক বাঁচিতে পারে, এই ৯০০ জনের নির্ব্বাচন কেমন করিয়া হইবে? জগতের লোক আজ স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছ যে এই মহামুহূর্ত্তে, এই জীবন মরণের সন্ধিস্থলে, যাত্রীর মধ্যে একজনও আপনার জীবন বাঁচাইবার জন্য লজ্জাজনক ব্যাকুলতা দেখা যায় নাই। জাহাজে বহু ধনকুবের ছিলেন, পৃথিবীর অদ্বিতীয় ধনী কর্ণেল আষ্টর প্রমুখ আমেরিকার অনেক ধনীলোক এই জাহাজে ছিলেন, ইচ্ছা করিলে অগণিত ধনরত্ন দিয়া তাঁহারা আপন আপন জীবন রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু ধন্য তাঁহাদিগের শিক্ষা, সভ্যতা এবং মনুষ্যত্ব, মৃত্যুকে সম্মুখীন দেখিয়াও কেহ বিচলিত হইলেন না—কেহ আপনার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ঘৃণ্য উপায় অবলম্বন করিলেন না, কিম্বা ব্যাকুলতা দেখাইলেন না।—সেই ভীষণ বিপদে যাহার যেখানে কাজ ছিল সে সেই খানে দাঁড়াইয়া কাপ্তেনের আদেশ পালন করিয়াছে এবং আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া মহাসাগরের লবনাম্বুরাশির মধ্যে অনন্ত কালের জন্য বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। আজ সমগ্র সভ্য জগৎ তাহাদিগের এই অদ্ভুত কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং ত্যাগস্বীকারের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অশ্রুজলের সহিত তাহাদিগের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছে।

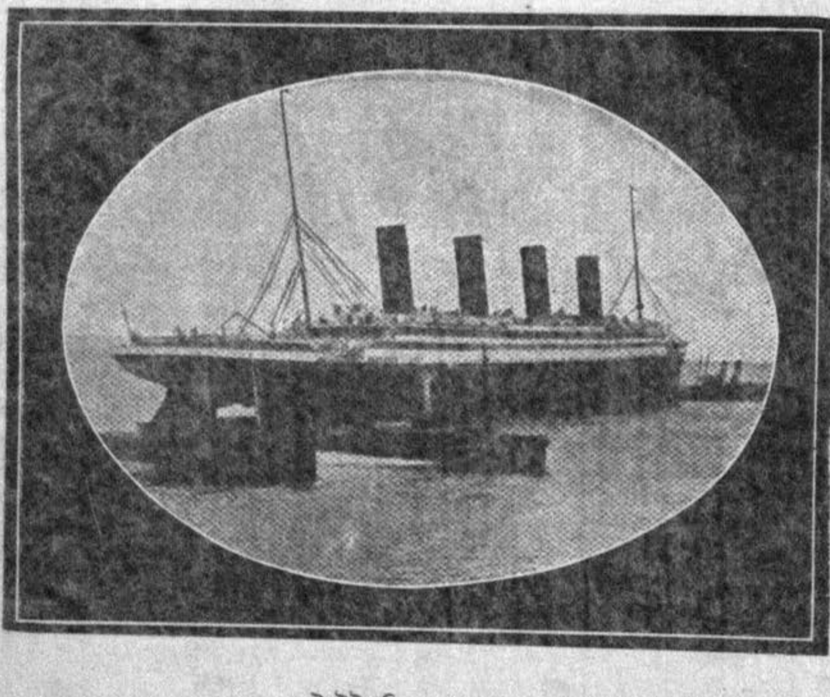
সকলে ডেকের উপর সমবেত হইল কাপ্তেন জলদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, যাত্রী দলের মধ্যে যাঁহারা পুরুষ তাঁহারা পিছাইয়া যান আগে স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। এই আদেশ শুনিয়াই পুরুষেরা পিছাইয়া গেলেন। তখন স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগকে তাড়াতাড়ি কিছু খাওয়াইয়া দেওয়া হইল কারণ ইহারা জলিবোটে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অকুল সমুদ্রে ভাসিবে। কোথায় যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই। মহাসাগরের তরঙ্গরাশি যে দিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে সেই দিকেই ইহারা ভাসিতে ভাসিতে যাইবে। তাহাদের আশা এই যে, যদি সমুদ্রগামী কোনও জাহাজ তাহাদিগকে দেখিতে পায় তাহা হইলে তাহাদিগের উদ্ধার হইবে। বোটে মানুষের যাইবার স্থান নাই সুতরাং আহার্য্য ও পানীয় কোথায় রাখিবে? এই জন্য সকলকে তাড়াতাড়ি পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দেওয়া হইল।

তখন একখানি জলিবোটে স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগকে পুরিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই সময়কার হৃদয় বিদারক দৃশ্য বর্ণনা করা যায় না। স্বামীর বক্ষ হইতে স্ত্রীকে ছিনাইয়া লওয়া হইল, পিতার কোল হইতে কন্যাকে কাড়িয়া লওয়া হইল এবং এইরূপে বলপ্রয়োগ করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে বোটে পাঠান হইতে লাগিল। অনেক স্ত্রীলোক কিছুতেই আপন স্বামীকে ফেলিয়া বোটে গেলেন না, তাঁহারা স্বামীর সঙ্গে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। নাবিকেরা কিছুতেই সেই স্ত্রীলোকদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না। সীমাহীন আকাশ যেমন সীমাহীন বারিধিকে সেই অসীমের মধ্যে আলিঙ্গন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি এই সকল কল্যাণী সাধ্বী রমণী আপন আপন স্বামীর বক্ষে মাথা রাখিয়া অনন্ত কালের মত সেই অসীমের মধ্যে ডুবিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন। মানুষের যুক্তি তর্ক তাঁহাদিগকে স্বামীর আলিঙ্গন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না। রমণী! তোমার এই প্রেমের পরাকাষ্ঠা, সতীত্বের কাহিনী চিরদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়া রাখিবে। যে সকল অন্ধ তার্কিক বলে যে প্রেম ও সতীত্ব শুধু দেশ বিশেষেরই সম্পত্তি, আজ তাহারা চক্ষু মেলিয়া দেখুক যে প্রেম এবং নিষ্ঠা দেশ কাল এবং পাত্রে আবদ্ধ নহে। ইহা সমগ্র বিশ্বের সৌরভ এবং রমণী হৃদয়ের সর্ব্বস্ব, ইহা সকল দেশে এবং সকল স্থানেই সমানভাবে সুগন্ধ বিতরণ করে এবং এই তাপদগ্ধ পৃথিবীতে স্বর্গের সঙ্গীত শুনায়।

আমেরিকার ধনকুবের কর্ণেল অ্যাষ্টর এবং যুক্তরাজ্যের সভাপতি মিঃ টাফটের এডিকং মেজর বাট্, এই দুইজনে অনেক স্ত্রীলোককে বোটে উঠাইয়া দিতে সাহায্য করিতে লাগিলেন। আষ্টর আপনার স্ত্রীকে ও অনেক রুগ্ন ও ভয়বিহ্বলা রমণীকে বোটে উঠাইয়া দিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত অসীম উৎসাহের সহিত এই উদ্ধার কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন, কিন্তু একবার ভ্রমেও নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন না। কি মহান স্বার্থ ত্যাগ! এই জাহাজে আর এক মহাপ্রাণ বড়লোক ছিলেন। কাউণ্ট টলষ্টয়ের পর সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে এমন মহাপ্রাণ ব্যক্তি আর দ্বিতীয় ছিলেন না। ইনি সুবিখ্যাত রিভিউ অব্ রিভিউ পত্রিকার প্রথিত নামা সম্পাদক মিঃ ষ্টেড্। জগতের যেখানে দুঃখ, এবং অবিচার—যেখানে প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়াছে, সেইখানেই মহামতি ষ্টেড্ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে অত্যাচার দমন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইতেন। দীন দুঃখীর এমন বন্ধু আর কেহ নাই। এই মহাপ্রাণ সম্পাদক এই জাহাজে যাত্রী ছিলেন। আমেরিকায় একটা কংগ্রেস হইতে ছিল, সেই কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্য মিঃ ষ্টেড এই জাহাজে



বিশ্বহিতৈষী ৮ মহাত্মা ডব্লিউ, টি, ষ্টেড।



টাইট্যানিক জাহাজ।

আমেরিকা যাইতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর বিশেষ বিবরণ কিছুই বাহির হয় নাই। একজন নাবিক সেই ভীষণ রজনীতে ষ্টেড্‌কে জাহাজের রেলিং ধরিয়া একবার দাঁড়াইতে দেখিয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন যে ষ্টেড্ যখন দেখিলেন যে বাঁচিবার আর কোন উপায় নাই তখন ধীরে ধীরে আপনার ক্যাবিনে যাইয়া দরজা বন্ধ করিলেন, সেই হইতে আর কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। আবার কেহ কেহ বলেন যে জাহাজ যখন ডুবিয়া গেল তখন কর্ণেল অ্যাষ্টর এবং ষ্টেড্ উভয়ে সাঁতার দিয়া একটা কাঠের ভেলা ধরিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে বরফ জলে একেবারে অবশাঙ্গ হইয়া ধীরে ধীরে অতলজলে ডুবিয়া গিয়াছেন। এইরূপে জগতের দুইজন অদ্বিতীয় লোক মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন অদ্বিতীয় ধনী। ইনি বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইলেও এই ভীষণ দুর্দ্দিনে মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া অসংখ্য গরীব রমণীর প্রাণ বাঁচাইয়াছেন এবং শেষে আপনার স্ত্রীকে বোটে উঠাইয়া দিয়া নিজে নাবিকদিগের সহিত সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আর একজন আজীবন গরীব দুঃখীর জন্য সংগ্রাম করিয়া শেষে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে যখন দেখিলেন যে নিজে জীবন দান করিলে আর একটী অসহায় গরীবের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে তখন তিনি সেই নিস্তব্ধ রজনীতে ধীরে ধীরে অপরের অলক্ষিতে আপনার কক্ষে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। পাছে সেই মরণোন্মুখ যাত্রীদিগের ভীষণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া বীরের হৃদয় বিচলিত হয়, তাই বোধহয় মহামতি ষ্টেড্ সকলের অজ্ঞাতে আত্মগোপন করিয়া নিজের কক্ষে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং পলকে পলকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শেষে যখন বুঝিলেন যে সব শেষ হইয়া গিয়াছে তখন অ্যাষ্টরের সহিত নিজেও সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

আর একটা প্রাণস্পর্শী দৃশ্য এই :—এক নারী স্বামীকে ছাড়িয়া কিছুতেই যাইবেন না। স্বামী বলিলেন "প্রিয়তমে! বাড়ীতে আমাদের অসহায় সন্তানগুলি রহিয়াছে। তাহাদের মুখ স্মরণ করিয়া তুমি আপনার প্রাণ রক্ষা কর।" সন্তানের কথা স্মরণ করিয়া সে নারী কান্দিতে কান্দিতে তখন নৌকায় উঠিলেন।

৭০ জন নারী স্বামীর আদেশ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া নৌকায় উঠিলেন। তাঁহাদের স্বামিগণ জাহাজের সহিত জলমগ্ন হইলেন। যে নারী স্বামীর জন্য অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে, সেই নারীর চক্ষের সম্মুখে স্বামী জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ৭০ জন নারী বিধবা হইলেন।

আর এক অদ্ভুত কাহিনী বাহির হইয়াছে, ইহা মার্কনি যন্ত্রে যে কর্ত্তব্যপরায়ণ যুবক তারহীন সংবাদ প্রেরণ করিতেছিল তাহার। জাহাজ ডুবিতে আরম্ভ করিলে

কাপ্তেন স্মিথ ইহাকে ক্রমাগত চারিদিকে বিপদের বার্ত্তা প্রেরণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যুবক অবিচলিত ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে আপনার ক্যাবিনে বসিয়া তার পাঠাইতেছিল। বাহিরে বাঁচিবার কত আয়োজন হইতেছে, বোটে উঠিয়া মানুষ আত্মরক্ষা করিতেছে—কিন্তু যুবকের সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, একাগ্র-মনে কাপ্তেনের আদেশ পালন করিতেছে। জাহাজ ক্রমে ক্রমে প্রায় ডুবিয়া আসিল, এই সময় বহুদূর হইতে কার্পেথিয়া নামক জাহাজ সংবাদ পাঠাইলেন যে ভয় নাই, তোমাদের বিপদের সংবাদ পাইয়াছি, উদ্ধারের জন্য রওনা হইলাম। এই সম্বন্ধে যুবকের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু যন্ত্র ছাড়িয়া যাইবার আদেশ ছিলনা. সুতরাং যুবক সেখানে বসিয়া আপনার কর্ত্তব্য করিতে লাগিল। ক্রমে যুবকের ক্যাবিনের মধ্যে জল আসিল, ঢেউয়ের পর ঢেউ আসিয়া যুবকের পাদমূল ধৌত করিতে লাগিল। এই সময় কাপ্তেন আসিয়া বলিলেন "যুবক! তুমি তোমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছ, এখন নিজের প্রাণ বাঁচাও"। ইহার নাম মিঃ ফিলিপ, দুঃখের বিষয়, ইহার প্রাণ রক্ষা হয় নাই। বহুদিন পূর্ব্বে ইংরাজ বালক ক্যাসা-বিয়াঙ্কার কর্ত্তব্যপরায়ণতার কাহিনী পড়িয়াছিলাম এবং মনে আছে পড়িতে পড়িতে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। আজ আবার কতকাল পরে আর এক ক্যাসা-বিয়াঙ্কার কাহিনী পড়িয়া চক্ষের জল রাখিতে পারিতেছি না। ধন্য সেই জাতি, যে জাতির মধ্যে বিপদের সময় শত শত, সহস্র সহস্র ক্যাসাবিয়াঙ্কা দেখা দেয় এবং আপনার কর্ম্মস্থলে দাঁড়াইয়া কর্ত্তব্য পালন করিত করিতে হাসি মুখে মৃত্যুকে আলি-ঙ্গন করে। এ জাতি বড় হইবে না ত জগতে কে বড় হইবে?

জাহাজখানা ডুবিবার পরে আর এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। সে দৃশ্য অতি ভয়াবহ; যাহারা সাঁতার জানিত তাহারা সাঁতার দিয়া বোটের নিকট আসিল, যাহারা বোটে ছিল তাহারা প্রাণপণে অনেককে টানিয়া তুলিল এবং যতক্ষণ মানুষ ধরে ততক্ষণ মজ্জমান ব্যক্তিদিগকে বোটে উঠাইতে লাগিল; শেষে যখন আর বোটে স্থান নাই তখন মজ্জমান ব্যক্তিরা হাত তুলিয়া বলিল "আর না, আর না, আমরা আর তোমাদিগকে বিপন্ন করিব না—ভগবান তোমাদিগকে রক্ষা করুন, আমাদিগকে বিদায় দাও।" কি আশ্চর্য্য শিক্ষা ও সংযম! কি শোকাবহ দৃশ্য! বোটে এবং ভেলার উপর যাহারা ভাসিতেছিল তাহারা সকলে ঠেসাঠেসি করিয়া পিঠে পিঠ ঠেকাইয়া বসিয়াছিল। এমন কি একটু জোরে নিঃশ্বাস পড়িলেও নৌকা ডুবিয়া যাইত। রাত্রি প্রভাতে যখন কার্পেথিয়া জাহাজ ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিল তখন কেহ মুখ ফিরাইয়া সে জাহাজের দিকে চাহিয়া দেখিতেও পারে নাই, পাছে মুখ ফিরাইতে গেলে

নৌকা উল্টাইয়া যায় তাহার পর কাপ্তেন স্মিথের কথা। ইঁহার সাহস, বীরত্ব এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতার কথা চিরদিন সকলের মনে জাগরূক থাকিবে। এখন জানা যাইতেছে যে এই বিপদ ঘটিবার কিছু পূর্ব্বেই টাইটানিকের টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারী রাত্রিতে হঠাৎ এক তার পাইলেন যে নিকটেই প্রকাণ্ড দুইটী বরফস্তূপ ভাসিয়া আসিতেছে। টাইটানিকের অগ্রগামী কোনও জাহাজ অপরাপর জাহাজকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য বিনা তারে এই সংবাদ পাঠাইয়া ছিলেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারী জাহাজের কাপ্তেনকে উহা জানাইয়াছিলেন এবং কাপ্তেনও একজন লোককে মাস্তুলের উপর হইতে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সেই লোকটী যখন বরফস্তূপ দেখিতে পাইল তখন জাহাজ থামাইবার আর সময় ছিল না। দেখিতে দেখিতে বিশালকায় জাহাজ পূর্ণবেগে বরফস্তূপের উপর আসিয়া পড়িল এবং তাহার পর যে কারণে উহা নিমেষের মধ্যে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। স্মিথ যখন এই বিষম বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন এবং দেখিলেন যে জাহাজ বাঁচাইবার আর কোনও উপায় নাই, তখন মানুষের যাহা সাধ্য তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জাহাজে অনেক ক্রোরপতি ছিলেন, ইচ্ছা করিলে কাপ্তেন স্মিথের জীবন বাঁচাইতে পারিতেন, তাহা ছাড়া দুই এক জন ক্রোরপতির জীবন রক্ষা করিয়া নিজেও লক্ষপতি হইতে পারিতেন। বিপদের সময় জাতীয় চরিত্রের সমুদয় ভাব এবং প্রকৃতি যেমন সহজে বাহির হইয়া পড়ে, এমন আর কোন সময়েই হয় না। এই বিষম দুর্দ্দিনে কাপ্তেন স্মিথের আচরণ দেখিয়া ইংরাজ চরিত্রের মহত্বে ও বীরত্বে সমগ্র হৃদয় আনন্দে এবং বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তিনি নিমেষের মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। মার্কনি যন্ত্রের পরিচালককে মহাসমুদ্রের চারিদিকে এই বিপদের বার্ত্তা জানাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়া এবং অধস্তন কর্ম্মচারী ও নাবিকগণকে লইয়া যাত্রীদিগের প্রাণ বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সকল যাত্রী যখন ডেকের উপরে সমবেত হইল তখন ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে তিনি অকম্পিত কণ্ঠে সকলকে কহিলেন "পুরুষেরা পিছাইয়া যাও আগে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে।" ইহাদের অধিকাংশই দরিদ্র, আর যাহাদের পিছু সরাইয়া দিলেন তাহারা অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, কিন্তু তাহাতে কি হইবে?—জাহাজের চিরন্তন রীতি রক্ষা করিতে হইবে দুর্ব্বলকে আগে বাচাইতে হইবে – নিজের প্রাণ দিয়া নারীকে রক্ষা করিতে হইবে—এ সে নীতি নয় যে নীতিতে বলিয়াছে,

আত্মানং সততং রক্ষেৎ
ধনৈরপি দারৈরপি।

তার পর ধীরে ধীরে জাহাজ ডুবিতে লাগিল। স্মিথ্ তখনও জাহাজের সেতুর উপর দাঁড়াইয়া চারিদিকের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন এবং নাবিকদিগকে কর্ত্তব্য পালনে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এমন সময় দূরে দেখিলেন যে একখানি বোটে কয়েকজন যাত্রী ভয়ানক জনতা করিতেছে। এরূপ করিলে হয়ত এখনই উহা জলমগ্ন হইবে, সুতরাং তাহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বোট তখন দূরে চলিয়া গিয়াছে, এত দূরে তাঁহার কণ্ঠ স্বর পৌছাইবে না, কিন্তু সতর্ক করা প্রয়োজন, তাই স্মিথ তৎক্ষণাৎ মেগাফোন যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "ছিঃ! ইংরাজের ন্যায় আচরণ কর—অধীর হইও না"। স্মিথের আর এক জন সহ-কর্ম্মচারী স্ত্রীলোকদিগকে শেষ নৌকায় বোঝাই করিয়া দিয়া সেই নৌকার নাবিকের হাত ধরিয়া বলিয়া দিলেন—"আমার স্ত্রীকে যাইয়া বলিও আমি আমার কর্ত্তব্যপালন করিয়া মরিয়াছি"। এইবার স্মিথ দেখিলেন যে মানুষের যাহা সাধ্য তাহা তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ করিয়াছেন, আর কিছুই করিবার নাই। তখন তিনি তাঁহার অনুরক্ত নাবিক-দিগকে একত্র করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইলেন। মাস্তলের নিকটস্থ সেতুর উপর দাঁড়াইয়া কাপ্তেন বিধাতার নিকট তাঁহার শেষ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন—নাবিকগণ বাদ্য যন্ত্র আনিয়া সুর বাঁধিলেন। সকলে উচ্চ কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন "Nearer to thee O God" (হে ভগবান আমাদিগকে তোমার আরও নিকটে লইয়া যাও)। একজন যাত্রী এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—আমরা বোটে বসিয়া দেখিলাম দূরে সাগর জুড়িয়া বিশালকায় টাইটানিক্ ধীরে ধীরে জলধি-বক্ষে ডুবিয়া যাইতেছে। কাপ্তেন জাহাজের সমুদয় আলো জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন, সেই আলোকমালা সমুদ্র জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া দূর হইতে সমগ্র জাহাজখানিকে একটা মায়াপুরীর ন্যায় দেখাইতে ছিল। আর সেই জাহাজের উপরে কাপ্তেন স্মিথ নীরব নিস্তব্ধ হইয়া মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জাহাজের উপর হইতে উপাসনা সঙ্গীত ব্যাণ্ডের সুরে মিলিত হইয়া আকাশ বায়ুকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল—ক্রমে সেই সঙ্গীত ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল—সে আলোকমালা একে একে নিবিয়া গেল—তাহারপর?—তাহারপর পৃথিবীর অদ্বিতীয় জাহাজ তাহার কাপ্তেনকে আপনার চূড়ার উপর বসাইয়া সাগরগর্ভে ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল"।

১৪ই এপ্রিল রবিবার রাত্রি প্রায় সাড়ে দশ টার সময় টাইটানিক জাহাজের সহিত তুষার পর্ব্বতের সংঘর্ষণ হইয়াছিল, রাত্রি ২টার সময় ১৫৯৫ জন যাত্রী সহ জাহাজ জলমগ্ন হইল। ৫৩৫ জন যাত্রী ও ২১০ জন নাবিক, কেহ

নৌকায় কেহ ভেলায়, কেহ বা জলের মধ্যে ভাসিতে লাগিল। বিনা তারে এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া কার্পেথিয়া জাহাজ রাত্রি ৪ টার সময় তথায় পঁহুছিয়া অকূল সমুদ্রে ভাসমান লোকদিগকে নিজ বক্ষে আশ্রয় দান করিল।

(সঞ্জীবনী হইতে গৃহীত।)

ঋগ্বেদে স্বর্গের বিস্তীর্ণ বর্ণনা।

১১৩ সূক্ত, ৭-১১ ঋক্।

৭। যে ভুবনে সর্ব্বদা আলোক, সে স্থানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত আছে। হে ক্ষরণশীল! সেই অমৃত ও অক্ষয় ধামে আমাকে লইয়া চল। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৮। যে স্থানে বৈবস্বত রাজা আছেন, সে স্থানে স্বর্গের দ্বার আছে, যে স্থানে এই সমস্ত প্রকাণ্ড নদী আছে, তথায় আমাকে লইয়া গিয়া অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৯। সেই যে তৃতীয় নাগলোক, তৃতীয় দিব্যলোক, যাহা নভোমণ্ডলের উর্দ্ধে আছে, যথায় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করা যায়, যে স্থান সর্ব্বদা আলোকময়, তথায় আমাকে লইয়া গিয়া অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

১০। যথায় সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, যথায় ব্রধ্নানামক দেবতার ধাম আছে, যথায় যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তি লাভ হয়, তথায় আমাকে লইয়া গিয়া অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

১১। যথায় বিবিধপ্রকার আমোদ, আহ্লাদ, আনন্দ বিরাজ করিতেছে, যথায় অভিলাষী ব্যক্তির তাবৎ কামনা পূর্ণ হয়, তথায় আমাকে লইয়া গিয়া পূর্ণকাম ও অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

১০ম মণ্ডল—৫৬ সূক্ত।

১। এই (অগ্নি) তোমার এক অংশ আর এই (বায়ু) তোমার এক অংশ, তোমার তৃতীয় অংশ জ্যোতির্ম্ময় (আত্মা) স্বরূপ। এই তিন অংশদ্বারা তুমি (অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য) মধ্যে প্রবেশ কর। তোমার শরীরের প্রবেশ কালে তুমি কল্যাণমূর্ত্তি ধারণ কর এবং দেবতাদিগের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পিতা স্বরূপ (সূর্য্যের) ভুবনে তুমি প্রিয় হও।

২। হে বাজিন (জনৈক ঋষিকুমার)! পৃথিবী তোমার শরীর গ্রহণ করিতেছেন, তিনি আমাদিগের প্রীতিজনক হউন, তোমারও কল্যাণ করুন। তুমি স্থান ভ্রষ্ট না হইয়া জ্যোতিঃ ধারণ করিবার জন্য দেবতাদিগের সহিত এবং আকাশের সূর্য্যের সহিত তোমার আত্মাকে মিশাইয়া দাও।

৩। হে পুত্র! তুমি বিলক্ষণ বলে বলী ও সুশ্রী ছিলে। যেরূপ উত্তম স্তব

করিয়াছিলে, তদ্রূপ উত্তম স্বর্গে যাও। তুমি উত্তম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার উত্তম ফল প্রাপ্ত হও। উত্তম দেবতা ও উত্তম সূর্য্যের সহিত একীভূত হও।

৪। আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ দেবতার মত মহিমার অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবতাদিগের সহিত ক্রিয়া কলাপ করিতেছেন। যে সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দীপ্তি পাইয়া থাকে, তাঁহারা উহাদিগের সহিত একীভূত হইয়াছেন, তাঁহারা দেবতাদিগের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

৫। তাঁহারা নিজ ক্ষমতাবলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিয়াছেন। যে সকল প্রাচীন ভুবনে কেহ যায় নাই, তাঁহারা তথায় গিয়াছেন। তাঁহারা নিজ শরীর দ্বারা সমস্ত ভুবন আয়ত্ত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রজাবর্গের উপরে নানা প্রকারে নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

৭। লোকে যেরূপ নৌকাযোগে জল পার হয়, যেরূপ স্থলপথে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দিক্ অতিক্রম করে, যেরূপ স্বস্তি দ্বারা বিপদ্ হইতে উদ্ধার হয়, তদ্রূপ বৃহদুক্থ ঋষি নিজ ক্ষমতাবলে আপন মৃত পুত্রকে অগ্নি প্রভৃতি পার্থিব পদার্থ ও সূর্য্য প্রভৃতি দূরবর্ত্তী পদার্থের সহিত একীভূত করিয়া দিলেন।

৬৩ সূক্ত।

১। যে সকল দেবতা অতি দূর দেশ হইতে আসিয়া মনুষ্যদিগের সহিত বন্ধুত্ব করেন, তাঁহারা বিবস্বতের পুত্র মনুর সন্তানদিগের প্রতি অতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে আশ্রয় দান করেন। তাঁহারা নহুষ পুত্র যযাতির যজ্ঞে অধিষ্ঠান হয়েন এবং তাঁহারা আমাদিগের মঙ্গল করেন।

২। হে দেবতাগণ! তোমাদিগের সকল নামই নমস্কার করিবার যোগ্য, বন্দনীয় এবং যজ্ঞে উচ্চারণ যোগ্য। যাঁহারা অদিতির গর্ভে জন্মিয়াছেন, কিংবা জলে কিংবা পৃথিবী হইতে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সকলে আমার এই আহ্বান শ্রবণ করুন।

৩। সকলের জননীভূতা পৃথিবী যাহাদিগের জন্য মধুময় দুগ্ধ বহাইয়া দেন, এবং সমাকীর্ণ, অবিনাশী, আকাশ অমৃত ধারণ করেন, সেই সকল অদিতি সন্তান দেবতাদিগকে স্তব করেন, তাহাতে মঙ্গল হইবে, তাঁহাদিগের ক্ষমতা অতি প্রশংসনীয়, তাঁহারা বৃষ্টি আহরণ করেন, এবং তাঁহাদিগের কার্য্য অতি সুন্দর।

৪। সেই সকল প্রবল পরাক্রান্ত দেবতা লোকের নিকট পূজা পাইবার জন্য অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা অনিমেষ নয়নে মনুষ্যদিগকে দর্শন, অর্থাৎ তত্ত্বাবধান করেন। তাঁহাদিগের রথ জ্যোতির্ম্ময় *, তাঁহাদিগের কার্য্যের বিঘ্ন নাই, তাঁহারা নিষ্পাপ, তাঁহারা লোকের মঙ্গলের জন্য স্বর্গের উন্নত প্রদেশে বাস করেন।

* বেদে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে যাহা জ্যোতির্ম্ময় তাহাই দেবতাদিগের স্বরূপ, যথা দ্যুলোক দেবলোকের নামান্তর মাত্র।

৫। মনু অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে সাত জন হোতা লইয়া যে সকল দেবতার উদ্দেশে অতি উৎকৃষ্ট হোমের দ্রব্য উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই সমস্ত দেবতা আমাদিগকে অভয় দান করুন এবং সুখী করুণ, আমাদিগের সকল বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিন এবং সর্ব্বত্র কল্যাণ বিতরণ করুণ।

৮। যাঁহাদিগের বুদ্ধি উৎকৃষ্ট এবং জ্ঞান সুন্দর, যাঁহারা স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জগতের অধীশ্বর, হে তাদৃশ দেবতাগণ! এক্ষণে আমাদিগকে অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল পাপ হইতে উদ্ধার করুন এবং আমাদিগকে কল্যাণ বিতরণ করুন।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

রক্ত আমাশার অব্যর্থ ঔষধ।

রক্ত আমাশার প্রথম অবস্থায় পেয়ারা পাতার রস অতি উপকারী। ইহাতে পেটের মল সমুদায় পরিষ্কার হইয়া বাহির হইয়া যায় ও অল্প সময়ের মধ্যে আরাম হয়।

কাল জামের পাতার রস ও ছাগল দুধ রক্ত আমাশার মহৌষধ। ইহাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে রক্ত বন্ধ হয় ও কমিয়া আসে। তিন চার দিন প্রাতে একবার করিয়া খালি পেটে উহা সেবন করার বিধি।

পুরাতন ও নূতন উভয় রক্ত আমাশা জ্বরের পক্ষেই পুরাতন তেঁতুল ও ইসবগুল ও মিশ্রি একত্র ভিজাইয়া প্রাতে ও দুপুরে সেবন করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য্য উপকার পাওয়া যায়।

যাঁহারা গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ছোট শিশুদের এই অসুখের জন্য অত্যন্ত কষ্ট পান তাঁহারা এই ঔষধটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

নূতন সংবাদ।

কুমারী কর্ণেলিয়া সরোবজী বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কোর্ট অব ওয়ার্ড সমূহের অস্থায়ী পরামর্শ দাত্রী ছিলেন, এখন হইতে তিনি এই পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

"ওলন্দাজ বণিক" নামক লর্ড ফিবারসামের বেসব্রান্টের অঙ্কিত একখান ছবি ছিল, উহা তিনি ৭॥০ সাড়ে সাত লক্ষ টাকা মূল্যে নিউইয়র্কের মিঃ ক্রিসের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন।

লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রগণের তত্ত্বাবধানের জন্য যে কমিটি হইয়াছে, তাহারই সংশ্রবে ক্রমওয়েল রোডে একটি বাড়ী আছে। ঐ বাড়ীতে ভারতীয় আইন

পাঠার্থী ছাত্রগণের সুবিধার জন্য এক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইবে। সার টমাস্ র‍্যালে এই লাইব্রেরীতে অনেক গুলি পুস্তক দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। লাইব্রেরী গৃহের আসবাবাদির জন্য ২২৫০ টাকা ও পুস্তক কিনিবার জন্য কতক টাকা দিয়াছেন এবং লাইব্রেরী রক্ষার জন্যও বৎসরে ১৫০০ টাকা দিবেন।

কয়েক বৎসর হইতে কতিপয় স্কটলণ্ডের জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত ভূমি কম্পের কারণ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তাঁহারা ৭০০ ভূমিকম্প পরীক্ষা করিয়া বলিতেছেন পৃথিবীর অক্ষ পরিবর্ত্তনের সময়ই প্রায় ভূমিকম্প হইয়া থাকে।

মোকামা ঘাটে গঙ্গার উপর সেতু নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে।

শুনা যাইতেছে, টাইট্যানিক জাহাজের দুস্থ যাত্রীদিগের সাহায্যের নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত ৪২ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে।

পানিহাটী অক্ষয় কুটীর নিবাসী প্রতিভাশালী নবীন সুলেখক শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় দুইটি রৌপ্য পদক ও এক খানি মূল্যবান পুস্তক প্রদান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বামাবোধিনীর গ্রাহকগণের মধ্যে যে গ্রাহক মহাশয় "মাদকতা নিবারণের উপায়" ও গ্রাহিকা মহোদয়াগণের মধ্যে যিনি "পল্লিগ্রামে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজন ও তাহার প্রকৃষ্ট উপায়" সম্বন্ধে গবেষণা পূর্ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন তাঁহারাই পদক দ্বয় প্রাপ্ত হইবেন। উক্ত ঠিকানায় ভাদ্রের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে প্রবন্ধ প্রেরণ করিতে হইবে। পরীক্ষান্তে পূজার পর পুরস্কার দেওয়া যাইবে। তবে উপযুক্ত প্রবন্ধ শীঘ্র প্রাপ্ত ও মনোনীত হইলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে। হরিপ্রসাদ বাবুর সাধু উদ্দেশ্যের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ।

সতী শৈবলিনী।

প্রশস্ত কক্ষের মাঝে ধবল শয্যায়
শায়িত যুবক এক রোগশীর্ণ কায়
পার্শ্বে বসি চিন্তাকুল আত্মীয় স্বজন
কাতর নয়নে হেরে তাহার আনন।
পদতলে সমাসীনা শোকাকুলা জায়া
সৌন্দর্য্য প্রতিমা যেন মূর্ত্তিমতী মায়া
অনন্ত অমিয়সিক্ত পূত প্রেম পাশেরে
বাঁধিয়া রাখিতে চায় হৃদয় বিলাসে।

নিরমম কাল আসি বসিয়া শিয়রে
যুবকের প্রাণ ধরি আকর্ষণ করে
কিন্তু হের পতি প্রাণা রমণীর বল
করিতেছে তার সর্ব্ব প্রয়াস বিফল।
সহসা চাহিলা যুবা কাতর নয়নে
অশ্রুমতী শোকাতুরা বণিতার পানে
প্রেম পূর্ণ অর্থ পূর্ণ নীরব ভাষায়
যেন হায়! হৃদি ব্যথা প্রকাশিতে চায়।

নিরাশ জড়িত সেই দৃষ্টি সকরুণ
ছিঁড়িল সতীর হৃদে শেল নিদারুণ
বুঝিল সে স্বামী তার মাগিছে কাতরে
অনন্ত বিদায় হায় চিরদিন তরে।
পতিপ্রাণা দৃষ্টিমাত্র পারিলা বুঝিতে
স্বামীর পরাণ পাখী চাহে না ত্যজিতে
হৃদয় পিঞ্জর হায়! তাহার কারণ
মৃত্যুসনে প্রাণপণে করিতেছে রণ।
বুঝিলা সে সতী আর নাহিক উপায়
বিফল যতন, পতি পরাণরক্ষায়
ধীরে ধীরে উঠে বালা ত্যজি দীর্ঘশ্বাস
সহসা ফুটিল তার মুখে মৃদু হাস।
ত্যজিয়া স্বামীর পাশ চলিলা ভামিনী
অম্বর ত্যজিয়া যেন উজলা দামিনী
যতনে পরিল সতী অম্লান অম্বর
যাপিতে পতির পাশে অনন্ত বাসর।
চরণে অলক্ত রাগ সীমন্তে সিন্দুর
ধরিল হাসির রেখা আনন বিধুর
চারি বৎসরের শিশু লয়ে তায় কোলে
মুহুর্মুহু চুম্ব দেয় বদন কমলে।
পুনঃ আসি বসে সতী পতির চরণে
সহসা ভবন খানি ভরিলা কিরণে
কেহ না বুঝিলা হায়! তাহাদের ভাব
সকলেই মুহ্যমান শোকেতে নীরব।
ক্ষণ পরে পুনঃ সতী দেবতার ঘরে
চলিলা সহাস্যমুখে প্রফুল্ল অন্তরে
ভক্তি ভরে ভিক্ষা করে পতির মঙ্গল
কাতর পরাণ তার রুদ্ধ আঁখি জল।
উঠিল দ্বিতল কক্ষে মহা গণ্ড গোল
আত্মীয় স্বজন কণ্ঠে রোদনের রোল
যুবার পরাণ পাখী যায় বুঝি চলি
হৃদয় পিঞ্জর খানি চিরতরে ভুলি।
চমকি উঠিল সতী আকুল পরাণ
যেন চারি ভিতে কিছু করে অন্বেষণ
গোপনে আধার হ'তে দ্রবময় সুরা
ঢালিল মস্তকে নিজ পতি শোকাতুরা।
নিজ হস্তে অগ্নি জ্বালি প্রদানিল তায়
সহসা হাসিল কক্ষ আলোক মালায়
হাসিলা আহুতি পেয়ে দেব হুতাশন
ভীম তেজে সতীদেহ করিলা বেষ্টন।
অনল মণ্ডিত দেহ উর্দ্ধ যুক্ত করে
ধরিয়া পবিত্র 'গীতা' ধায় বেগভরে।
হাস্যমুখী হেরিবারে পতির চরণ
পুরাতে প্রাণের তার শেষ আকিঞ্চন।
সহসা শ্বশুর তার আসি নিম্নতলে,
দেখিলা সে বধূমাতা মণ্ডিতা অনলে
সভয়ে সকলে ডাকে উচ্চ কণ্ঠ স্বরে
অমনি প্রতিমা খানি পড়ে ভূমি পরে।
হায়! হায়! সর্ব্বনাশ দেখে সবে আসি
ধরাতলে বিলুণ্ঠিত শরতের শশী
সেবিতে অনন্তধামে পতির চরণ
অনলে সরলা বালা ত্যজিল জীবন।
মা মা বলি ক্ষুদ্র শিশু করিলা ক্রন্দন
বালকের আর্ত্তনাদে পুরিল ভবন
উঠিল শোকের রোল কাঁদে সর্ব্বজন
তারি মাঝে যুবা এবে ত্যজিল পরাণ।
স্তম্ভিত দর্শক বৃন্দ বিস্মিত নয়ন
হেরি হেন অপরূপ যুগল মরণ
সবে কহে ধন্য! ধন্য!! সতী সাধ্বী রাণী
অর্জ্জিলে অক্ষয় কীর্ত্তি নিজ প্রাণ দানি।
স্বর্গ হতে দেবগণ দেখিল চাহিয়া
সতীর এ আত্মদান পতির লাগিয়া

দিনমণি তীব্রতেজে কর প্রসারিয়া
চাহে যেন গ্রাসিবারে কৃতান্তে ধরিয়া।
শোক তপ্ত হৃদে রবি গেলা অস্তাচলে,
উত্তপ্ত দীরঘ শ্বাস ত্যজি ধরাতলে,
নেমে এল সন্ধ্যা সতী বিষাদ আননে
হেরিতে সতীর মৃত্যু পতির মরণে।
ত্বরা করি নিশারাণী আসিলা ধরায়
আবরিয়া নিজদেহ মলিন ভূষায়
আত্মীয় স্বজন এবে হরি ধ্বনি করি
চলিলা শ্মশানে দুটী শব স্কন্ধে ধরি।
রমণীর আর্ত্তনাদে কাঁদিল গগন
কাঁদিল স্বরগধামে সুরবালাগণ
মিলিত সে অশ্রুরাশি প্রবল ধারায়
বৃষ্টি রূপে দেখা দিল তাপিত ধরায়।
মনোরম চিতা রচি রাখিল দুজনে
তদুপরি বিভূষিয়া কুসুম চন্দনে
মুহুর্মুহু হরিধ্বনি কাঁপিল গগণ,
সবার হৃদয় আজি বিস্ময়ে মগন।
উঠিল চিতার ধূম আবরি গগন
স্বর্গ হ'তে দেবগণ করে বরিষণ
পারিজাত ফুলমালা দম্পতির শিরে
সমবেত সবে সতীসম্মানের তরে।
ত্রিদিব আসন হ'তে দেব সুরপতি
আদেশিলা সারথিকে "যাও দ্রুতগতি
ল'য়ে এস সযতনে দুইটী রতনে
ত্যজেছে জীবন সতী পতির কারণে"।
সহসা উন্মুক্ত হ'ল স্বরগ তোরণ
মনোহর পুষ্পরথ দিল দরশন
আসিল শ্মশানভূমে দিক আলোকিয়া
লয়ে গেল পতি পত্নী দুজনে তুলিয়া।
যাও মা স্বামীর সনে অমর ভুবনে
অনন্ত শান্তির মাঝে ভ্রম দুই জনে
সেথা কভু পশিবেনা বিদ্রুপের হাসি
নাহি সেথা ঈর্ষা দ্বেষ অশান্তির রাশি।
যে কীর্ত্তি পশ্চাতে রাখি করিলা গমন
লভিবে মা তায় তুমি অক্ষয় জীবন
অনন্ত এগাথা তব গাহিবে সকলে
পতি তরে সতী প্রাণ ত্যজিল অনলে।
হেররে নয়ন মেলি হিন্দুর সন্তান
কলুষিত কার্য্যে তোরা সদা নিমগন
আর ওই গৃহ কোণে সতী পতিব্রতা
তোদের মঙ্গল তরে পুণ্য কার্য্যে রতা।
হিন্দুর অস্তিত্ব লুপ্ত হ'ত এত দিন
যদি না রহিত হেথা সাধ্বী নারীগণ
ডুবে যেত নদীগর্ভে ধর্ম্ম সনাতন,
ঘৃণ্য ব্যভিচারে সবে ঢেলে দিত প্রাণ॥

শ্রীনীরদ শশী ঘোষ
৪১ নং চড়কডাঙ্গা রোড
বেলেঘাটা।

বামারচনা।

নব বর্ষ।

এস নব বর্ষ, লয়ে প্রীতি হর্ষ
এস ভাই, এস প্রফুল্ল মনে।
অতীতের কথা, অতীতের ব্যথা
দাও যাইতে অতীতের সনে।

নবীন উৎসাহে এস নব বর্ষ,
নবীন আনন্দে মাতিয়া যাও।
তব আগমনে, মানবের মনে
প্রীতির প্রবাহ ঢালিয়া দাও।
মুছে দাও দুঃখ, শোক, ব্যথা, যত
প্রেম প্রীতি দিয়া পূরাও প্রাণ।
প্রণয়ের হারে বাঁধ আজি সবে
নব প্রাণ সবে কর গো দান।
এস নব বর্ষ লয়ে নব হর্ষ
নব ভাবে কর প্রফুল্ল সবে।
হাসিতে হাসিতে এসহে নূতন
দাও গো বিদায় অতীতে তবে।
অতীতের কথা, অতীতের ব্যথা
কি কাজ তুলিয়া ভুলিয়া যাও।
মনের হরযে নূতন বরষে
আদরে সবাই বরিয়া লও।
জয় জগদীশ! চির প্রেমময়!
প্রণমি সদাই চরণে তব।
নূতন আনন্দে জগত তোমার
থাকে সদা নাথ, নিতুই নব।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

কত দূরে?

(শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র সেন বি, এ, দাদা মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে)*

একে একে হায়
কত দিন চলে যায়
কোথায় রয়েছ তুমি কিছুই জানিনা
সুদূরে সংসার রাখি
হ'য়ে কার অনুরাগী
ভুলিয়াছ প্রাণাধিক! আপনার জনা।
সরায়ে কুহেলি রাশি
হেথায় নীরবে বসি
মরমের ব্যাকুলতা তোমারে জানাই।
হৃদি তন্ত্রী ছিন্ন করে
সুখে আছ কোন্ পুরে
জানিনা সে দেশ কোথা, কত দূরে ভাই।
মরতের মৃদু গানে
মরতের বংশী তানে
তোমার শ্রবধ মন হয় না চঞ্চল।
মরতের স্নিগ্ধ আলো
আর নাহি লাগে ভাল
স্বরগের বংশী রবে রয়েছ বিহ্বল।
তাই নাহি কাছে এস
আর নাহি ভাল বাস,
পশেনা শ্রবণে তব মৃদু আলাপন।
অজানিত দেশে গিয়ে
কেমন স্বভাব পেয়ে
ভুলিয়াছ জননীর আদর যতন।
বালিকা দয়িতা তব
বিসর্জ্জন দিয়ে সব
কঠোর বৈধব্য ব্রত করেছে ধারণ।
তব স্মৃতি বুকে ধরে
এ সংসার কারাগারে
যৌবনে যোগিনী প্রায় যাপিছে জীবন।

* ২৭ বৎসর বয়সে দ্বারভাঙ্গায় দাদার মৃত্যু হয়।

অসীম যাতনা ভারে
মৃদু হিয়া ভেঙ্গে পড়ে
এ দীর্ঘ বিরহ তাপ সবে কতকাল।
সংসারের প্রতি যায়
শুথায়ে ঝরিবে হায়
হায়রে কঠিন বিধি, কি পোড়া কপাল।
মা তব পাগল শোকে
হৃদয় ভেঙ্গেছে দুঃখে
সবারি মলিন মুখ কি ভীষণ হায়।
তব শোকে আহা মরি!
পিতা যে এ ধরা ছাড়ি
গিয়াছেন তব পাশে শান্তির আশায়।
মুহূর্ত্তে করিলে ভাই
সোনার সংসার ছাই
ডুবাইয়ে দুঃখময় অকূল পাথারে।
বাল বনিতার বুকে
দুটী কচি মেয়ে রেখে
কোথায় রয়েছ তুমি, হায় কত দূরে।

শ্রীপ্রিয়বালা রায়।

১৬।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আন্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 586.

June, 1912.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৯ বর্ষ। ৫৮৬ সংখ্যা।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।	১০ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভারত সম্রাটের জন্মদিন—আগামী ৩রা জুন ভারত সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে উপাধি বিতরণ ব্যতীত আর কোন উৎসব হইবে না এইরূপ শুনা যাইতেছে।

কংগ্রেস—আগামী ডিসেম্বর মাসে বাঁকিপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, এখন হইতেই তাহার আয়োজন হইতেছে। মিঃ মোজাহরল হক্ সম্ভবতঃ অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হইবেন।

নূতন দীল্লি—যে স্থানে দীল্লির রাজধানী হইবে তাহা এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অনেক স্থান সাক্ষাৎভাবে গবর্ণর জেনারেলের শাসনাধীনে থাকিবে। এই স্থানের শাসন প্রণালী কিরূপ হইবে তাহা এখন বিবেচিত হইতেছে। কোন স্থানে রাজধানী স্থাপিত হইবে স্থির হইলেই ভারত গবর্ণমেন্ট শাসন ভার গ্রহণ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে বিলাত হইতে যে সকল ইঞ্জিনিয়ার আসিয়াছেন তাঁহারা শীঘ্রই সিমলা যাইয়া স্থান সম্বন্ধে লর্ড হার্ডিঞ্জের সহিত পরামর্শ করিবেন।

কুমারী রক্ষার্থ বিল—দাক্ষিণাত্যের অনেক দেবালয়ে অল্প বয়স্কা কুমারীদিগকে দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়। তাহারা দেবদাসী হইয়া অতি ঘৃণিত জীবন যাপন করে। এই ঘৃণিত পথ হইতে বালিকাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা ও আন্দোলন হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে মিঃ দাদা ভাই শীঘ্রই এই সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল উপস্থিত করিবেন। এতদ্বারা ১৬ বৎসরের নিম্ন বয়স্কা বালিকাদিগকে দেবদাসী করা যাইতে পারিবে না, এবং তাহাদিগকে অন্য প্রকারে ও উৎপীড়ন করা হইবে না। এই শুভ বিলের উদ্দেশ্য সফল হউক।

পারস্যশঙ্কট—সালের এদ্দৌলা পারস্যের ভূতপূর্ব্ব সাহের পক্ষ হইয়া এখনও

গোলযোগ বাঁধাইতেছেন, তাঁহাকে পারস্য হইতে চলিয়া যাইবার জন্য বলা হইয়াছে, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিতেছেন না। সম্প্রতি প্রিন্স ফারমান ফরমা হামাদানে সালেরএদ্দৌলা কর্তৃক পরাজিত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। ইহাতে পারস্যে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে।

মিঃ ষ্টেডের স্মৃতি রক্ষা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বজন প্রিয় উদারচরিত্র মহাত্মা ষ্টেডের স্মৃতি রক্ষার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন। মহৎ চরিত্রের লোক সর্ব্ব দেশেই পূজনীয়।

ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষার ফল।

প্রথম বিভাগ।

১। বেকার গ্রেস—লরেটো হাউস।
২। নলিনীবালা বসু—আলেকজেণ্ড্রা গার্লস স্কুল, ময়মনসিং।
৩। সুজাতা বসু—ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়।
৪। নিশাময়ী বিশ্বাস—ক্রাইষ্ট চার্চ্চ স্কুল।
৫। সীতা চট্টোপাধ্যায়—বেথুন স্কুল।
৬। ইন্দুমতী দত্ত—প্রাইভেট।
৭। বিজবালা বাপানিয়া—গার্ডনার মেমোরিয়াল স্কুল।
৮। ইন্দুপ্রকৃতি ঘোষ—আলেকজাণ্ড্রা হাইস্কুল ময়মনসিং।
৯। যোগিনী ঘোষ ঐ।
১০। নীরপ্রভা গুপ্ত—প্রাইভেট।
১১। সুধাপ্রভা গুপ্ত—ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়।
১২। তটিনী গুপ্ত—বেথুন স্কুল।
১৩। প্রমীলা হাজরা—ডাইওসিসন।

দ্বিতীয় বিভাগ।

১। ললিতা মিশ্র—এল্, এম্, এস্, বালিকা বিদ্যালয়।
২। সরোজাক্ষী মল্লিক—গার্ডনার মেমোরিয়াল স্কুল।
৩। লীলাবতী মণ্ডল—ঐ।
৪। কিরণবালা সেন—ইডেন হাই স্কুল ঢাকা।

তৃতীয় বিভাগ।

১। লেনা বারাক্—এল, এম্, এস্, স্কুল।
২। কমলা দাস—প্রাইভেট।
৩। প্রতীভা গুহ—ইডেন হাইস্কুল। ঢাকা।

আই, এস, সি ও আই, এ পরীক্ষা।

এবার আই, এস, সি, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ২০৫ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৩০৪ জন ও তৃতীয় বিভাগে ৪৫ জন, মোট ৫৫৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহার মধ্যে দুই জন পরীক্ষার্থিনী অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

আই, এ, (ইণ্টারমিডিয়েট আর্টস) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৪৬৯ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১২০৯ জন ও তৃতীয় বিভাগে ৩১৩ জন, মোট ১৯৯১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২০ জন ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রথম বিভাগে ৯ জন, দ্বিতীয়

বিভাগে ১১ জন। নিম্নে উত্তীর্ণ ছাত্রীদিগের নামের তালিকা প্রদত্ত হইল।

আই, এস, সি।

প্রথম বিভাগ।

১। নলিনী সরকার—সিটি কলেজ।
২। সুরীতি মিত্র—সিটি কলেজ।

আই এ।

প্রথম বিভাগ।

১। কর্ণেলিয়া সেসিল—প্রাইভেট।
২। কন্সটেন্স ব্রাউন— „।
৩। বিভাবতী মিত্র—বেথুন কলেজ।
৪। শান্তা চট্টোপাধ্যায়—„।
৫। কিরণবালা চাটার্জ্জী—ডাওসিসন কলেজ।
৬। ডেসি বসু—প্রাইভেট।
৭। লিলিয়ন ডোভেরিয়া „।
৮। হেনরি এটা অবলা সরকার—ডাইওসিসন কলেজ।
৯। নীহার সরকার বেথুন কলেজ।

দ্বিতীয় বিভাগ।

১। ইন্দুপ্রভা বিশ্বাস—বেথুন কলেজ।
২। প্রিয়তমা চট্টোপাধ্যায়—ডাইওসিসন কলেজ।
৩। সুপ্রভা দাস—বেথুন কলেজ।
৪। তিলত্তমা দে— „।
৫। ফ্যানি কন—প্রাইভেট।
৬। জুলিয়া গোমস্—„
৭। লাওডে গারটুড কনকলতা—ডাইওসিসন কলেজ।
৮। মোহিতবালা মজুমদার—বেথুন কলেজ।
৯। শোভা মুখোপাধ্যায়—„।
১০। নিকোলাস ডোরা—প্রাইভেট।
১১। কুসুম কুমারী সরকার—বেথুন কলেজ।

প্রায়শ্চিত্ত।

দশম পরিচ্ছেদ।

অনেক দিন নবকিশোর বাবুর কথা বলা হয় নাই। চারি বৎসর হইয়া গিয়াছে, নবকিশোর বাবু একা সেই বিপুল পুরীর মধ্যে বাস করিতেছেন। দাস, দাসী, লোক জনের অভাব নাই, তথাপি তিনি একা। প্রাতে উঠিয়া নিয়মিত স্নান করেন, পূজা করেন, পরে বহির্ব্বাটীতে বসিয়া বৈষয়িক কার্য্যাদি দেখা শুনা করেন। যথা সময়ে আহার করিয়া এক খানি শ্রীমদ্ভাগবত হস্তে লইয়া শয়ন করেন। পড়িবার অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু অবসন্ন চক্ষু দুটী ধীরে ধীরে মুদিয়া যায়। পুস্তক হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া যায়।

বৈকালে ও বাহিরে গিয়া বসেন। উদ্যানে যাইতে আর ইচ্ছা হয় না। সেখানে গিয়া বসিলে চারিদিকে বড় বিশৃঙ্খলা বোধ হয়। চক্ষে কোথা হইতে কি ফোঁটা জল আসিয়া পড়ে। বৃদ্ধ বয়সের অকারণ রোদনে নবকিশোর আপনার কাছে আপনি লজ্জিত হইয়া

পড়েন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে দুঃখে বিচলিত হওয়াকে নবকিশোর বাবু ছেলে মানুষির মধ্যে গণ্য করেন।

নবকিশোর বাবু যখন বহিৰ্কক্ষে বসিয়া আছেন একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। লোকটী কায়স্থ, নবকিশোর বাবু আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "তবে মথুর বাবু কবে কল্‌কোতা থেকে এলে?"

"আজ্ঞে এই কাল এসেছি"

"যে কাজের জন্যে গিয়েছিলে তা সিদ্ধ হ'ল তো? মকর্দ্দমার কি হ'ল?"

"আজ্ঞে হঁ্যা আপনার আশীর্ব্বাদে সমস্ত মঙ্গল"। তাহার পর মথুর বাবু যে কত বুদ্ধি খাটাইয়া মকর্দ্দমা জিতিয়াছেন বহুক্ষণ বসিয়া আড়ম্বরে সহিত তাহার গল্প করিলেন। দুই জনে অনেক কথা হইল, অনেক তামাকু সেবন হইল, তখন "মথুর বাবু বলিলেন তবে আমি যাই, বেলা হয়েছে"। নবকিশোর বাবু অনেকক্ষণ হইতে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত উৎসুক হইতেছিলেন, একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাদের খবর কিছু জান? তারা কেমন আছে"? মথুর বাবু মস্তক অবনত করিলেন, নবকিশোর বাবু কম্পিত স্বরে বলিলেন "বৌমার খবর আমি জানি। আর আর সকলে কেমন আছে"? মথুর বাবু মাথা তুলিলেন না। নবকিশোর বাবু তাঁহার হাত দুটী ধরিয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন "তারা আছে তো? প্রাণে বেঁচে আছে তো"? মথুর বাবু নবকিশোর বাবুর হস্ত ধরিয়া বলিলেন "সে কি কথা, প্রাণে বেঁচে আছে বই কি, সকলে ভাল আছে।"

নিশ্বাস ফেলিয়া নবকিশোর বাবু বলিলেন "তবে কি?"

"নীরজার বিবাহ," "নীরজার বিবাহ, সেকি? কোন নীরজা"? "আপনার পৌত্রী নীরজা।" ধীরে ধীরে নবকিশোর বাবু দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন। ক্রমে শুইয়া পড়িলেন। তখনি পরিচারকেরা আসিয়া কেহ মাথায় জল দিতে লাগিল, কেহ বাতাস করিতে লাগিল। মথুর বাবু বেচারা অপ্রস্তুত ও হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন। সহসা নবকিশোর বাবু চিৎকার করিয়া বলিলেন "নীরো দিদি আমার"! মথুর বাবু সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। নবকিশোর উঠিয়া বসিলেন। "চুপ্‌কর, কথা কয়োনা। আমার দিদিকে সেই কুলাঙ্গারটা জোর করে বিয়ে দিচ্চে। শীঘ্র গাড়ী আন, আমি এখনি কলিকাতায় যাব"।

গাড়ী আসিল। নবকিশোর বাবু কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

বিমলাচরণ সন্ধ্যারপরে বাটীর দ্বারের সম্মুখস্থ ফুটপাতের উপরে চেয়ার পাতিয়া বসিয়া ছিলেন। সহসা শুনিলেন "বিমলাচরণ," চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখে উন্মত্ত মূর্ত্তি নবকিশোর বাবু। চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন "একি, বাবা"? নবকিশোর বাবু হস্তদ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া বলিলেন "আমি তোর পিতা নই।

কুলাঙ্গার একি শুনি ?” বিমলাচরণ পিতার উন্মত্তের মত চক্ষু দেখিয়া ভয় পাইলেন, তথাপি সাহস করিয়া বলিলেন "আমি কুলাঙ্গার কিসে ?”

"কুলাঙ্গার না হলে বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে যাস্” ! কুলাঙ্গার ন’স ?”

বিমলাচরণের এবার মর্ম্মান্তিক রাগ হইল। রক্তিম লোচনে বলিলেন "তা ত বটেই, দুগ্ধপোষ্য কন্যার বিবাহ দিয়া সর্ব্বনাশ কর্‌লেন আপনি, আর কুলাঙ্গার হলুম আমি? যে, বিবাহ হয়েছে কিনা জানেনা, সেই বালিকা কন্যাকে আজীবন বৈধব্যানলে জ্বলানই ত কুলাঙ্গারের কার্য্য ! বাপের কর্ত্তব্য সন্তানকে সুখী করা”। "কেন বিবাহ দেওয়া ভিন্ন কি কন্যাকে সুখী করিবার অন্য উপায় নাই ? কন্যাকে সৎপথ দেখিয়ে দে, সে দান করুক, ধর্ম্ম করুক, দুঃখীর দুঃখ মোচন করুক, অনাথকে আশ্রয় দিক্, এই তো সুখ. সুখ আবার কি ? বাপ হ’য়ে কন্যাকে শিক্ষা দিতে জানিস্ না" ? বিমলাচরণের আঁতে ঘা পড়িল। সে পুত্র কন্যাকে শিক্ষা দিতে জানে না ? "বেশী কথার প্রয়োজন নাই, আমার কন্যা, আমি আমার বিশ্বাস মত তাহাকে শিক্ষা দিয়াছি, আপনার এ বিষয়ে বিবাদ নিষ্প্রয়োজন, ইচ্ছা করেন, আদালত খোলা আছে। কিন্তু মনে রাখ্‌বেন নীরজা আমার কন্যা"। বিমলাচরণ ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গেট টানিয়া দিলেন। মর্ম্মাহত নবকিশোর বাবু উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন—

"নীরজা, নীরজা, দিদি, কোথায় আছিস, আমার কাছে পালিয়ে আয়” ?

বৃদ্ধের উচ্চ কণ্ঠ সেই কঠিন প্রাসাদের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া ত নীরজার কর্ণে প্রবেশ করিল না। বিমলাবাবু ফটক খুলিয়া বাহিরে আসিয়া ধীরভাবে বলিলেন "নীরজা স্ব ইচ্ছায় মোহিতকে বিবাহ করতে মত দিয়েছে”।

"নীরো মত দিয়েছে ? আমার নীরো ? ও সে ত জানে না যে সে বিধবা”। "জানে, তাহাকে সে কথা বলা হয়েছিল"।"

মূহুর্ত্তের মধ্যে নবকিশোর বাবু অদৃশ্য হইলেন। বিমলাচরণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন কেহ নাই। কেবল একটা কঠোর, অস্পষ্ট শব্দ মাত্র কর্ণে আসিল।

হৃদয়ে মহা অশান্তি লইয়া বিমলাচরণ উপরে গেলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল "কি হইবে, কি জানি, হে ভগবন্! হে ভগবন্! নীরজা ও সুরেশকে সুখী করিও, যদি আমি কোন ভুল করিয়া থাকি তাহার ফল যেন তাহাদের স্পর্শে না।" উপরে উঠিয়া দেখিলেন আলোকিত কক্ষে নীরজা বসিয়া কতকগুলি পোষাক ঠিক্ করিয়া রাখিতেছে। পিতাকে দেখিয়া নীরজা ত্রস্ত হইয়া বারান্দায় আসিল। তাহার সলজ্জ রক্তিম মুখ খানি দেখিয়া বিমলাচরণ সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। কাল নীরজার বিবাহ।

সেই কাল আসিল। বাটীময় কত আলোক জ্বলিল, ফুলের ছড়াছড়ি, সুগন্ধের

ছড়াছড়ি হইল। কত নিমন্ত্রিত অভ্যাগত আভ্যাগতায় গৃহ পূর্ণ হইল। কত মঙ্গল গীত হইল। তারপরে আচার্য্য মোহিত কুমারের সহিত ব্রাহ্মমতে নীরজার বিবাহ সম্পন্ন করিলেন। অঙ্গীকার মন্ত্র গুলা নীরজা বড় অস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছিল, কি জানি কেন তাহার মনে একটা ভীতির সঞ্চার হইতেছিল। স্ত্রীর জন্য যখন বিমলাবাবুর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল তখন নীরজাও কাঁদিয়া ফেলিল। বিমলা বাবু তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া শান্ত করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ শান্ত হইয়া নীরজা একবার মোহিতের মুখের দিকে চাহিল, মোহিতের প্রফুল্ল হাস্যময় মুখ এবং অনুরাগ ও স্নেহ পূর্ণ চক্ষু দেখিয়া নীরজার সে অজ্ঞাত ভয়টা দূর হইল।

নবকিশোর বাবু ট্রেণে চড়িয়া হরিশপুরে ফিরিয়া চলিলেন, দেখিলেন আর একটা সম্ভ্রান্ত ভদ্রবেশী লোক তাঁহার সঙ্গে ট্রেণে উঠিলেন।

কয়েকটা ষ্টেশন চলিয়া গেল, তথাপি কেহ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিলেন না। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে নবকিশোর বাবুর মস্তিষ্কটা বড় গরম বোধ হইতে লাগিল। একটু অন্যমনা হইবার জন্য বলিলেন "মহাশয়ের নাম"? ভদ্র লোকটী বলিলেন "নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়"।

"মহাশয় কি নিজ কলিকাতা হতেই আস্‌ছেন"?

আজ্ঞা "হাঁ, আপাতত তাই বটে। আপনিও কলিকাতা হইতে আসছেন?"

আজ্ঞা হাঁ আমিও আপাততঃ তাই"। তখন ক্রমশঃ দুই বৃদ্ধে নানা বিষয় কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সুখ দুঃখের কথা পড়িল। নবকিশোর বাবু বলিলেন "সুখ দুঃখ ওসব মানুষের কামনার বিকার মাত্র"। নন্দবাবু বলিলেন "মহাশয় তা যথার্থ কিন্তু এমনি বিকার যে তাহাতে বড় কষ্ট সহ্য করতে হয়। হতভাগাকে মানুষ করলুম, লেখাপড়া শিখালুম, সব কেবল ভস্মে ঘৃতাহুতি হইল"। নবকিশোর বাবু ভাবিলেন এ কার কথা বলিতেছে, ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন "কথাটা কি বল্‌চেন মহাশয়"?

"কি আর বলব মহাশয়, ছেলেটা বি, এল পাশ দিল, লোকে বলত এমন ছেলে হয় না। শেষে কিনা সে একটা বিধবা বিবাহ করলে। হরি হে দীনবন্ধু! তুমিই সত্য, আর সব মিথ্যা।" এই বলিয়া নন্দবাবু দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিলেন। নবকিশোর বাবু ও বহু কষ্টে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন কা'র কন্যা বিবাহ করলে?"

"সেও এক কুলাঙ্গার। বিমলাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, উকিল, তারি কন্যা"। উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন। তাহারপর নন্দ বাবু একটু নড়িয়া চড়িয়া হাই তুলিয়া বলিলেন "সে যেমন আমায় কষ্ট দিল, আমিও ঠিক তত কষ্ট তাকে দিব। তাকে এক পয়সাও দিবনা, সমস্ত ছোট ছেলেকে দেব। উপযুক্ত প্রতিশোধ নয় কি, মহাশয়? পাপিষ্ঠের পাপের শাস্তি আমিই দিতে জানি, ভগবানকে আর

কষ্ট করিতে হবে না।" নবকিশোর বাবু কোন উত্তর দিলেন না। নন্দবাবু বলিলেন "আমি তেমন বাপ নই যে মায়া মমতায় দোহাই দিতে যাব! দেখা করে বলিলাম 'বিধবা বিয়ে করবি, বেশ, কর কিন্তু জেনে রাখিস আমার এক পয়সাও তোর নয়, তুই আমার ত্যজ্য'। হতভাগা কোন উত্তর দিল না। শুনেছি আজ রাত্রেই বিবাহ।" "দূর হোক্, মহাশয়! ছুটো ভগবানের নাম করুণ। হরি হে তুমিই সত্য"। তখন নন্দবাবু গান ধরিলেন "তুমি কার, কে তোমার, কারে বল রে আপন, মোহমায়া নিদ্রাবশে হেরিছ স্বপন"। নব কিশোর বাবু প্রস্তর মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নীরজা ও মোহিতের বিবাহের পর তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। মোহিত এখন আলিপুর কোর্টে ওকালতি করে। পসারও এক রকম হইয়াছে, তবে ব্যবসায় কার্য্যে সে সুদক্ষ হয় নাই ইহা নিশ্চিত, কেননা অন্যান্য উকিলের ন্যায় সে সকলের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিত না, অনেক অর্থ হীন দরিদ্র বিনা অর্থে মোহিত বাবুকে উকীল করিয়া মোকর্দ্দমা চালাইত। অক্ষম ও দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তি দেখিলে মোহিত আপনি সাধিয়া তাহার উকীল হইয়া তাহার মোকর্দ্দমা জিতাইয়া দিত। তাই মোহিত বাবু উকীলের নাম যতটা ছিল অর্থ ততটা আসিত না।

ইহাতে নীরজা অসুখী ছিল না। সে শিশুকাল হইতে পরদুঃখ কাতরা ছিল, সে জানিত তাহার মত স্বামী সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তাই যখন স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া স্বামীর দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ শুনিত, স্বামী যখন নিজের কথা বলিতে গিয়া লজ্জিত হইতেন, তখন নীরজা সুখে আত্মহারা হইত। তাহার পর? আর একখানি শুভ্র কোমল এক বৎসরের কচিমুখ, চুম্বন করিতে করিতে যখন মোহিত, বারান্দায় পদচারণা করিয়া বেড়াইত তখন নীরজা ভাবিত আমি ঐ স্থানের মাটী হই না কেন, তাহা হইলে স্বামী আমার উপর দিয়া অমনি করিয়া বেড়াইয়া বেড়ান।"

দেড় বৎসর হইল বিমলাচরণ বাবুর মৃত্যু হইয়াছে। নীরজার বিবাহের পরেই বিমলাচরণ সুরেন্দ্রকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে সে সিবিল সার্ব্বিশ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তত হইতেছে। বিমলাচরণ মৃত্যুর সময় পুত্রকে শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ণ পত্র লিখাইয়া, কন্যা ও জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সঞ্চিত পঞ্চাশ হাজার টাকার সুদ এখন লণ্ডনে সুরেন্দ্রর নিকট যায়। বাটীর ভাড়াও তাহাই হয়। পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সুরেন্দ্র মোহিতকে ও নীরজাকে বহু আক্ষেপ করিয়া পত্র লিখিয়াছি। মোহিতও তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া উত্তর লিখিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

৺ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মজীবনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের কয়েক পৃষ্ঠা।

কলিকাতা হইতে আমাদের বাসগ্রাম মজিলপুর প্রায় ১৫।১৬ ক্রোশ দূরে। ইহা ভদ্রলোকের বাসভূমি ও একটি গণ্ড গ্রাম। এক সময় এই গ্রামের মধ্যেই ৪।৫টী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল এবং অন্যূন ৫০ খানি দুর্গা প্রতিমা পূজা হইত। অধিবাসীদিগের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ। কায়স্থ দত্ত জমীদার গ্রামের প্রায় একাধিপতি, কারণ অধিকাংশ লোক হয় তাঁহাদের সরকারে কাজ করেন, নয় তাহাদের অধিকারে জমী জমা করেন। জমীদারদের সংকীর্ত্তি অনেক এবং তাঁহারা দোল, দুর্গোৎসব, পাল, পার্ব্বণ ও পারিবারিক অনুষ্ঠান এবং যাত্রা, মহোৎসব, ভোজ প্রভৃতি দ্বারা গ্রামস্থ লোকদিগকে আমোদিত ও পরিতৃপ্ত করিয়া বশীভূত করিয়া রাখিতেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম চর্চ্চার প্রথম সূচনা— আমরা ১৮৫২।৫৩ সালে গ্রামস্থ হার্ডিঞ্জ স্থাপিত বিদ্যালয়ের ছাত্র। উচ্চতম শ্রেণীতে "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার" পুস্তক পাঠ করি। গ্রামের জ্ঞানী ও বিদ্যোৎসাহী বলিয়া প্রসিদ্ধ বাবু ব্রজনাথ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে আমি তাঁহার প্রণীত পুস্তক নকল করি। আমার বাঙ্গলা লেখা পরিষ্কার বলিয়া তিনি পছন্দ করিয়া সেই কাজের ভার আমাকে দেন। এই বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবকৃষ্ণ ভবানীপুরে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে বাটীতে আসিলে আমার প্রতি স্নেহ দেখাইতেন। ঘটনাক্রমে তাঁহাকে পাঠ পরিত্যাগ করিয়া বাটীতেই থাকিতে হইল। তিনি তত্ত্ববোধিনীর নিয়মিত পাঠক ছিলেন, ভবানী পুর ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার যোগ ছিল এবং সকল সাধু বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ দেখা যাইত। তিনি আমাকে বলিতেন "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে" যাহা লেখা থাকে সব সত্য এবং সেই পত্রিকা পাঠ করিতে দিতেন। তাঁহার নিকট রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ছিল, তাহাও আমাকে পাঠ করিতে দেন। পরে আমাদিগকে লইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার অনুকরণে এক সভা সংগঠন করেন, তিনি তাহার সম্পাদক, আমি সহকারী সম্পাদক। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গবিদ্যালয়ে ছাত্রদের রচনাদি শিক্ষার উন্নতির জন্য "বিদ্যাবিলাসিনী" নামে এক সভা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাই তিনি উন্নত ও বিস্তৃত আকারে গঠন করেন।

এই সভার অধিবেশনে সর্ব্ব প্রথমে রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতার মধ্য হইতে একটী পঠিত হইত। তৎপরে সভ্য দিগের নির্দ্দিষ্ট রচনা পাঠ ও তদ্বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হইত। সর্ব্বশেষে সভাপতির মীমাংসা নির্দ্ধারিত হইত। অনেক সভায় সম্পাদকই সভাপতির কার্য্য করিতেন। এই সভার আলোচনার ফলে মাদক সেবন ও আমিষ ভোজন পরিত্যাগ, স্ত্রীশিক্ষার প্রচার, বাল্যবিবাহ নিবারণ ও বিধবা বিবাহের সহায়তা বিধান ইত্যাদি বিষয়ে সংস্কার সভ্যগণের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। প্রথম দুইটী অনেকে কার্য্যেতেও পরিণত করিলেন। এই সঙ্গে একেশ্বরের উপাসনাতেও অনেকের অনুরাগ হইল।

জমীদার সন্তান হ—বাবু ভবানীপুরে থাকিয়া হিন্দু কলেজে পড়িতেন এবং ভবানী পুর ব্রাহ্মসমাজেও যাতায়াত করিতেন। তিনি দেশে আসিলে কখনও কখনও তাঁহার উদ্যান বাটীতে ব্রহ্মোপাসনা হইত। "নমস্তে সতে", "ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি" এই সকলের ছাপা কাগজ আনিয়া তিনি আমাদিগকে অভ্যাস করিতে দিতেন, শিবকৃষ্ণ বাবুও নেতৃ স্থানীয় ছিলেন। তিনি প্রাত্যহিক উপাসনা পুস্তক অবলম্বনে আমাদিগকে প্রতিদি ন উপাসনা করিতে শিখাইতেন এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপদেশ দিতেন। একদিন তাঁহার মনে হইল দেশের সকল লোককে আহ্বান করিয়া আমাদের সভার এক উৎসব করা যাউক। বঙ্গ বিদ্যালয় গৃহ ছবি, পুষ্প, পল্লব, দ্বারা সুসজ্জিত হইল এবং আলোকমালায় গৃহটী উজ্জ্বল হইল। জমীদারবাটীর যুবকেরাও সাজ সজ্জা দিয়া অনেক সাহায্য করেন। দেশের প্রধান লোক অনেকে সভায় সমাগত হন। জয়নগরের এক সুগায়ক কয়েকটী ব্রহ্ম সঙ্গীত গান করেন, আমি "ধর্ম্মের আবশ্যকতা" বিষয়ে এক প্রবন্ধ পড়ি, সভার কার্য্য বেশ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হয়। কিন্তু পরদিন প্রচার হইল যুবকেরা জুটিয়া ব্রাহ্মসমাজ করিয়াছে, তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করিতে হইবে। গ্রামে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। জমীদারেরা নেতৃত্ব লইয়া ভদ্র লোক দিগকে ডাকাইয়া সকলকে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করাইলেন—এ সভাতে যাহার সন্তান হউক, যাইলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। শিবকৃষ্ণ বাবুর উপর সকলের অধিক ক্রোধও বিরাগ হইল। ইহার ফল এই হইল কয়েকটী যুবক গোপনে গোপনে শিবকৃষ্ণবাবুর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

চৈতন্য।

কি নাম গাহিলে, গানে মোহিল যে তনুপ্রাণ,
ধন্য হ'ল পাপীর শ্রবণ।
দূরে গেল পাপ তাপ মিথ্যা হ'ল অপলাপ
মহাসত্য লভিল জীবন॥
পাতকের পথে হায় "জগাই" "মাধাই" ধায়
আরো যায় কত শত জন।
ধর্ম্মলোপে বসুন্ধরা যখন পাগল পারা
আসি প্রভু ফিরাইলে মন॥
অংহিসা অধর্ম্ম নাশি প্রেম মন্ত্র দিলে আসি,
ঘুচাইয়া বিরোধ বিবাদ।
কেবল আনন্দ নাম হ'রে কৃষ্ণ রাধা শ্যাম
ধন্য তুমি মহাপ্রভু পাদ॥
"তৃণাদপি সুনিচেন" কি সুন্দর? কি মহান?
অহমিকা শূন্য মন প্রাণ!
সর্ব্ব জীবে সম দৃষ্টি বাকা কি সরল মিষ্টি
করুণায় দ্রবিত পরাণ॥
দয়াময় আমি যেন লভি তব শিক্ষা ধন,
জীবনের কর্ত্তব্যে আমার—
নাহি করি অবহেলা, নাম গাইব সারা বেলা
যাঁবো ফিরি গৃহে আপনার।

শ্রীহরি প্রসাদ মল্লিক।
পানিহাটি অক্ষয় কুটীর।

মহাজন বাক্য।

আমার তৃষিত প্রাণ নীরবে: ঈশ্বরের অপেক্ষা করিতেছে। তাঁহা হইতেই আমার পরিত্রাণ। তিনিই আমার নিরাপদ দুর্গ। তিনিই আমাকে রক্ষা করিবেন। হে মানব! তুমি সকল আশা ভরসা তাঁহাতে নিবদ্ধ কর, কিছুতে বিচলিত হইও না। নিশ্চয় জানিও প্রভু পরমেশ্বরই আমাদের পরিত্রাতা। তাঁহাকে লইয়াই মানব জীবনের গৌরব।

প্রবাদ আছে যত হাসি তত কান্না, ঈশ্বর বলেন যত কান্না, তত হাসি। শেষে হাসি সেই তো ভাল, তবে কাঁদি, আরো কাঁদি, কাঁদিতেই থাকি। কান্নার উৎস শেষ করি, তারপর হাসির পালা আসিবে, তাহা আর শেষ হইবে না। বিধাতার বিধানে চরমে কান্না নাই, গোড়ায় কান্না জীবনের লক্ষণ। শিশু জন্মিয়া না কাঁদিলে ভয় হয় জীবিত নাই। কিন্তু দয়াময়ের অঙ্গীকার বাক্য এই, যে সময় আসিতেছে তখন আর কাঁদিতে হবে না। জীবন সংগ্রামে বিশ্বাস ও আশা লইয়া প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা কর। দয়াময় বলিতেছেন "সন্তান আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না"। আহা এই সুমিষ্ট আশ্বাস বাণী কি আশাপ্রদ নয়। প্রভু তো অন্তঃসার শূন্য প্রবোধ দিবার পাত্র নহেন, তবে কেন

আমরা অস্থির হই। প্রভু স্বয়ং বলিতেছেন "জান না কি কে তোমাকে সান্ত্বনা দিতেছে। সন্তান ব্যাকুল হইও না বিশ্বাস কর, শান্ত হও"।

শ্রীমতী রাধারাণী লাহিড়ী।

কথা রাখা।

সিংহ গড়ের নিবিড় বন রাজির পার্শ্ব দিয়া পার্ব্বতীয় নদী চিত্রা বহিয়া যাইতেছিল।

সে দিন দশহারা, তাই ঘাটে খুব মেলা হইয়াছিল। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রামের লোক সিংহগড়ে স্নান করিতে আসিয়াছিল। অরুণাও পিতামহীর সহিত বিজয়পুর হইতে দশহারার স্নান করিতে আসিয়াছিল।

নদীর ঘাটে সিংহগড়ের রাজা মৃত রামসিংহের পত্নী অরুণাকে দেখিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন। অরুণার অনিন্দ্য রূপ মাধুরি দেখিয়া তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল যে পুত্র অজয় সিংহের সহিত তাহার বিবাহ দেন। তাই সে দিন মধ্যাহ্ন কালে অরুণার পিতামহীকে ডাকাইয়া আনিয়া বিবাহের কথা পাড়িলেন।

চিত্রার পর পারে অরুণার পিতামহীর বাড়ি, তাঁহার আর কেহ ছিল না, এক মাত্র পৌত্রী অরুণাই তাঁহার বৃদ্ধ বয়েসের সম্বল। বৃদ্ধা যখন শুনিলেন অরুণার বিবাহ রাজ পুত্রের সহিত হইবে, তখন তাঁহার আর আনন্দ রাখিবার স্থান রহিল না, এক কথাতেই সব ঠিক হইয়া গেল। বর স্বয়ং কন্যা দেখিল, খুব পসন্দ হইল। এমন রূপসী সিংহগড়ে আর দ্বিতীয় ছিল না।

ইতি পূর্ব্বে শ্যামার সঙ্গে অজয়ের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছিল। শ্যামা সিংহগড়ের রঘু সিংহের কন্যা, সেও খুব সুন্দরী, কিন্তু অরুণার কাছে সে কিছুই নহে। রঘু সিংহ বড় দরিদ্র, মেয়েটীর রূপ দেখিয়া রাণী তাহাকে পুত্রবধু করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তারপর অরুণাকে দেখিয়া সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিলেন।

দুঃখী রঘু সিংহ বড় মর্ম্মাহত হইল। এক দিন সন্ধ্যা বেলা নৌকা করিয়া সে চিত্রাপারে অরুণাদের বাড়ি গিয়া তাহার পিতামহীকে ধরিয়া পড়িল। বলিল "মা আমি বড় দরিদ্র, এমন সঙ্গতি নাই যে মেয়েটিকে ভাল ঘরে দিতে পারি, তোমার ত পয়সা আছে আর মেয়েটীও খুব রূপসী, ইচ্ছা করিলে তুমি অন্যত্র বড় ঘরে দিতে পার। কিন্তু মা আমার আর উপায় নাই, শ্যামাকে ঐ ঘরে দিতে পারিলে আমার পরিবারবর্গের অন্নবস্ত্রের সকল কষ্ট ঘুচিত। এখন তুমি যদি দয়া কর তবেই দরিদ্রের প্রাণ রক্ষা হয়"।

বৃদ্ধা কিন্তু রাজি হইল না। রঘু অনেক

কাঁদা কাটা করিল, বুড়ি তথাপি অটল রহিল।

যে সময় রঘুর সহিত পিতামহীর কথা বার্ত্তা হইতেছিল, অরুণা পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠ হইতে সমস্তই শুনিয়াছিল। যখন রঘু সিংহ ভগ্নমনোরথ হইয়া উঠিয়া যাইতেছিল তখন সে সম্মুখে আসিয়া রঘুকে প্রণাম করিল। তাহারপর সে দয়ার্দ্র চিত্তে কহিল "সিংহ তুমি হতাশ হইও না, আমি ঐ বিবাহ করিব না, রাজপুত্রের সহিত তোমার কন্যারই বিবাহ হইবে"।

রঘু কহিল "সে কি প্রকারে হইতে পারে, তোমার পিতামহী ত সম্মত হইলেন না"।

অরুণা কহিল "তুমি যদি কোন উপায় করিতে পার ত হয়। আমার বিবাহে এক জনের ক্ষতি হইবে, এ কার্য্যে আমার রুচি নাই"। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রঘু কহিল "ইহার এক উপায় আছে ২৮শে ফাল্গুন বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে, ঐ দিন আমাকে এই বাড়িতে আনিতে পারিলেই হয়"। তার পর রঘু আর যাহা বলিল সে সমস্ত কথা চুপে চুপে হইল। অরুণা সম্মতি সূচক মাথা নাড়িল, রঘুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, যেন মেঘ কাটিয়া সূর্য্য রশ্মি দেখা দিল। সে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে বাড়ি ফিরিয়া গেল।

(২)

পিতামহী কহিলেন "অরুণা তোমার এ কি রূপ বুদ্ধি, নিজের ভাল মন্দ বোঝ না, এ কাজ কদাচ করিও না"। তখন ঠাকুর মা সমুদয় বলিলেন, অরুণা হাসিতে হাসিতে কহিল "ঠাকুর মা সব শুনিয়া ফেলিয়াছে"।

বৃদ্ধা কহিলেন "এ বোকামি কেন করিতেছ? হাতের লক্ষ্মী কখনও পায়ে ঠেলিও না"। অরুণা কহিল "ঠাকুর মা বাবার কথা ভুলিয়া গেছ? বাবা বলিতেন প্রাণ দিয়া পরের উপকার করিবে। এ পৃথিবী দু দিনের জন্য, কখন আছে কখন নাই"। ঠাকুর মা কিন্তু এ কথায় কাণ দিলেন না, আরও রাগ করিয়া, বলিলেন "সে হইবে না, আমি রাণীকে সব বলিয়া দিব।"

অরুণা কহিল "আমার বিবাহ ওখানে হইলে এক জনের আশা ভগ্ন হইবে; এমন কাজে আমার মঙ্গল হইবে না, আমি বিবাহ করিব না"। ঠাকুর মা সে কথায়ও কর্ণপাত করিলেন না। তখন অরুণা কহিল "যদি তুমি এমন কর তা হলে আমি মরিব"। বৃদ্ধা নিরস্ত হইলেন।

যথা কালে শুভ দিনে শুভ লগ্নে অজয় সিংহের সহিত অরুণার পরিণয় হইয়া গেল, বর নব বধূ লইয়া বাটি পৌঁছিলেন।

মহিষী বধূ ক্রোড়ে লইয়া অবগুণ্ঠন খুলিয়া বধূর মুখ দেখিলেন, কিন্তু একি! একেবারে বিস্ময়বিহ্বল কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, কহিলেন "ও মোহন এ কাহাকে আনিয়াছিস্, এত সে সোণার প্রতিমা নহে, এ যে রঘুর কন্যা, ও মা একি কাণ্ড?" তখন বর সমেত সমগ্র পুরী ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, মহা গণ্ড গোল

বাধিল। অজয়ের দূর সম্পর্কীয় মাতুল মোহন সিংহ একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন "তাই ত ভারি ঠকিয়েছে ত, অজয়ও কি কিছু টের পায় নাই" ? অজয় সিংহকেও ডাকা হইল সে মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল, অনেক গুলি প্রশ্নের একটীরও উত্তর দিল না।

তখন মাতার সেই ক্রোধানল নব পরিণীতা নিরীহ বালিকার উপর গিয়া পড়িল।

বধু অবগুণ্ঠনের ভিতর ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছিল। অবশেষে রঘুসিংহের ডাক পড়িল।

রঘুকে ধরিয়া মহিষীর নিকট হাজির করা হইল, রঘুসিংহ নতমুখে কর যোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাণী কহিলেন "রাজপুত এ চালাকি কেন করিলে? তুমি আমার প্রজা, তোমার ভিটায় ঘুঘু চরাইয়া ছাড়িব"।

রঘু পুর্ব্ববৎ করযোড়ে দুই গণ্ডে অশ্রু-ধারা বহাইয়া কহিল "ঠাকুরাণী আমায় মাপ করুন, আমি বড় দরিদ্র, আমার মেয়ে আপনার গৃহে দাসী হইয়া থাকিবে।" রাণী ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন, কহিলেন "তোমার মত জুয়াচোরের মেয়েকে আমি বাটীতে স্থান দিব না, দাসী হওয়া তো ভাগ্যের কথা, যাও মেয়ে লইয়া আমার দেশ ছাড়িয়া যাও, এখনি আমার সম্মুখ হইতে মেয়ে সরাইয়া লও, নচেৎ তোমার মঙ্গল হইবে না"। রঘু নির্ভীক চিত্তে অথচ কণ্ঠ স্বরে দ্বিগুণ কোমলতা ঢালিয়া পুর্ব্ববৎ কর যোড়ে কহিল "মা! শ্যামা আর কোথায় যাইবে, বিবাহ রীতি মত হইয়া গেছে, হিন্দুর ঘরে আর কোন উপায় নাই মা, আপনার পুত্রবধু রাখিতে হয় রাখুন মারিতে হয় মারুন ওর উপর আমার যে আর কোন অধিকার নাই মা"। রাণী তখন সপ্তমে উঠিয়া চিৎকার করিয়া কহিলেন মোহন! বেটাকে মেয়ে সমেত জুতা মারিয়া বাহির করিয়া দে আর সহ্য হয় না। রঘু গতিক মন্দ দেখিয়া পলায়ন করিল। যাইতে যাইতে সে উচ্চৈস্বরে কহিয়া গেল "হিন্দুর ঘরে শাস্ত্র মত বিবাহ হইয়া গেছে, এখন আর কোন কথা খাটিবে না ঠাকুরাণী!"

(৩)

পর দিন আর বৌভাত হইল না। রাণী কহিলেন "আমি সেই মেয়ের সহিত অজয়ের আবার বিবাহ দিব, তখন বৌ ভাত হইবে, এ বৌ ভাত এখন স্থগিত থাক"।

রঘু সম্বাদ পাইল অজয়ের অরুণার সহিত পুনরায় বিবাহ হইবে, বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেছে, কিন্তু এবারে বিবাহ কনের বাটীতে হইবে না, অরুণাকে সিংহগড়ে আনা হইবে, স্বয়ং অরুণার পিতামহী রাজবাটীতে আসিয়া এই রূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

রঘু সিংহ বিজয় পুরে অরুণার সহিত সাক্ষাৎ করিল, কাঁদিয়া কহিল "মাগো আমার শ্যামার সপত্নী হইতে তোমার

ডাক আসিবে, আমার শ্যামা মাতৃহীনা, স্বপত্নী হইলে সে একদিনও বাঁচিবে না" এই বলিয়া রঘু অরুণার পদতলে পড়িয়া গেল। অরুণা তাহাকে উঠাইয়া কহিল "তুমি কাঁদিও না আমা হইতে শ্যামার কোন ভয় নাই"।

রঘুনাথ কহিল "অজয়ের মাতা প্রতিজ্ঞা বদ্ধা হইয়াছেন তোমার সহিত পুত্রের বিবাহ দিবেন তাহার অন্যথা হইবে না, এখন মা! তুমি যদি অভয় দাও ত আমার মাতৃহীনা শ্যামা রক্ষা পায়"।

অরুণা কহিল "কি করিলে তোমার বিশ্বাস হয় বল আমি তাহাই করিব"। রঘু কহিল "তুমি এ দেশে থাকিলে আমার ভয় ঘুচিবে না"।

অরুণা কহিল "তুমি আমাকে দেশ ত্যাগ করিতে বলিতেছ?"

রঘু কহিল "হাঁ মা"।

অরুণা কহিল "অন্যত্র কোথাও আমার যাইবার স্থান নাই, আমার আর কোন আত্মীয় নাই, আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হয় না?"

রঘু কহিল "তোমার কথায় বিশ্বাস হয় মা, কিন্তু আমার শত্রু অনেক"।

অরুণা কহিল "তবে আমি শপৎ করিতেছি আমি এ দেশে থাকিব না, তোমার শ্যামার জন্য নিশ্চিন্ত হও"।

রঘু সুস্থ মনে বিদায় লইল।

(৪)

ফাল্গুনের অপরাহ্ন, দক্ষিণে বাতাস মৃদু মৃদু বহিতে ছিল, অস্তোন্মুখ বাসন্ত-রবির স্বর্ণকিরণ মালা চিত্রার চঞ্চল তরঙ্গশীরে তরল,স্বর্ণ স্রোতের মত ঝিক মিক করিতেছিল, আকাশে দূরে দূরে হেমাভ মেঘ শ্রেণী বড় সুন্দর ও উজ্জ্বল দেখাইতেছিল।

সেই সময় এক খানি শুভ্র বজরা সিংহ গড় অভিমুখে যাইতেছিল, তরণীতে অরুণা ছিল,তাহাকে সিংহগড়ে আনা হইতেছিল। আজ রাত্রে তাহার বিবাহ হইবে তাই মোহন সিংহ ও অজয়ের জননী স্বয়ং তাহাকে আনিতে বিজয় পুরে গিয়াছিলেন।

নৌকায় বিবাহের বাজনা বাজিতে ছিল।

অরুণা কহিল "মা এ বিবাহ হইতে পারিবে না," রাণী কহিলেন "কেন মা?"

অরুণা কহিল "আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বিবাহ করিব না, তাহার অন্যথা হইবে না।"

রাণী বিরক্ত হইয়া কহিলেন "তোমরা আমার প্রজা, আমার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, আমি কোন আপত্তি শুনিতে চাহি না।"

অরুণা চুপ করিয়া রহিল।

তরণী ক্রমে গভীর জলরাশীর উপর দিয়া ভাসিয়া চলিল, অকস্মাৎ একটা শব্দ হইল কি যেন জলে পড়িয়া গেল। সকলে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন অরুণা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, বজরা তখন অনেক দূর সরিয়া গেছে, তাহার আলতা মাখা রক্তাভ চরণ দুটী চিত্রার স্থির নির্ম্মল শ্বেত

জলপ্রবাহের উপর প্রফুল্ল পদ্ম ফুলের ন্যায় ভাসিতে ছিল।

মোহন সিংহ চিৎকার করিয়া কহিলেন "মাঝি মাঝি ধর ধর—"

ততক্ষণে অরুণা জল মগ্ন হইয়া গেল, দীনান্তের শেষ রবিরশ্মির সহিত তাহার স্বর্ণ দেহের শেষ কান্তিটুকু চিরার অগাধ বারিরাশির মধ্যে মিলাইয়া গেল।

"শেফালিগুচ্ছ" রচয়িত্রী

কর্ণেল গঞ্জ, এলাহাবাদ।

শিবপুর রাজকীয় উদ্ভিজ্জ উদ্যানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কর্ণেল রবার্ট কিড্, কলিকাতায় একটী উদ্ভিজ্জ উদ্যান প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। তিনি তৎকালে খিদিরপুরস্থ ডকের জাহাজ নির্ম্মাণ স্থানের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। গবর্ণর জেনেরল এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং লণ্ডনের সুপ্রীম বোর্ডও অনতিবিলম্বে ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত পরবৎসরে কর্ণেল কিডের আপন সালিমারস্থ উদ্যানের অব্যবহিত দক্ষিণ ভাগে যে প্রশস্ত ভূমিখণ্ড ছিল, তাহাই মনোনীত করা হইয়াছিল। এই ভূমি খণ্ডের পরিমাণ প্রায় ১৭৫ বিঘা। তাহাই এক্ষণে উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধীয় উদ্যানও বর্ত্তমান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রাঙ্গণ রূপে পরিণত হইয়াছে। কর্ণেল কিড্ উদ্ভিদ্ বিদ্যায় পারদর্শী ও অনুরাগী ছিলেন। তিনি আপনার সালিমারস্থ উদ্যান হইতে নানা প্রকার বৃক্ষ আনিয়া এই নব উদ্যানে রোপণ করিলেন। ১৭৯৩ অব্দ অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত তিনি এই উদ্যানের তত্ত্বাবধায়কের কার্য্য উত্তমরূপে নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। কর্ণেল কিডের মৃত্যুর পর গবর্ণমেণ্ট এক জন স্বতন্ত্র কর্ম্মচারীর হস্তে উদ্যানের ভার অর্পণ করিতে অনুমতি দেন। এই নিমিত্ত মান্দ্রাজস্থ কোম্পানির উদ্ভিদ্ বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিত ডাক্তার রক্সবর্গ তথা হইতে এখানে আসিয়া ১৭৯৩ অব্দের নবেম্বর মাসে শিবপুরস্থ উদ্ভিদ্ উদ্যানের তত্ত্বাবধায়ক পদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার বঙ্গে আগমনের পূর্ব্বে ডাক্তার রক্সবর্গ মান্দ্রাজ বিভাগস্থ উত্তর সরকারের বৃক্ষ সকলের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি উদ্ভিদ্ বিদ্যা বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ও অনুরাগী ছিলেন ১৮১৪ অব্দ পর্য্যন্ত এই মহাত্মা শিবপুরের উদ্যানের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তৎপরে তিনি শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কুমারীকা অন্তরীপে যাত্রা করেন ও তথা হইতে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপ হইয়া ইংলণ্ড গমন করেন এবং তাহার পরবৎসরে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

ডাক্তার র বর্গ: সর্ব্ব প্রথমে ভারতবর্ষের বৃক্ষ সমূহের দেশী নামসহ ফ্লোরা ইণ্ডিকা নামক একখানি পুস্তক সঙ্কলন করেন।

ভারতবর্ষে নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি ফ্লোরা ইণ্ডিকা নামক পুস্তক প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নানা প্রকার দেশীয় বৃক্ষ এবং কলিকাতার নিকটস্থ উদ্যান সমূহে রোপিত বিদেশীয় বৃক্ষ সকলের বিশেষ বিবরণ লিখিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে বাস কালে এই পুস্তক সেইখানে প্রকাশ করিবেন ভাবিয়া তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগের সময় ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানি সঙ্গে লইয়া যান। কিন্তু হায়! অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার সেই কল্পনা সুসিদ্ধ হয় নাই। ১৮২০ অব্দে ডাঃ ওয়ালিচ্ এবং ক্যারি কর্ত্তৃক সংশোধিত ও সংবর্দ্ধিত হইয়া এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হয়। অবশিষ্টাংশ ১৮৩২ অব্দ পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ ছিল। শেষোক্ত বৎসরে তাঁহার পুত্রদ্বয় কাপ্তেন জেমস্ রক্সবর্গ এবং ক্রম রক্সবর্গ এই পুস্তক যথাযথ মুদ্রিত করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন না। এই পুস্তকখানি পশ্চাল্লিখিত ভারতবর্ষীয় সমস্ত উদ্ভিদ্ বিদ্যা বিষয়ক পুস্তকের মূল। ইহার রচনা অতি প্রশংসনীয় এবং ইহার বর্ণনা গুলি বিশুদ্ধ এবং উত্তমরূপে লিখিত। ইহার লেখক রক্সবর্গকে "ভারতবর্ষীয় উদ্ভিদ্ শাস্ত্রের পিতা" বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

১৮৭২ অব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিখ্যাত উদ্ভিদ্ বিদ্যাবিৎ সার জোসেফ লুকারের "ফ্লোরা অব্ ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তক মুদ্রিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, রক্সবর্গের পুস্তকই ভারতবর্ষীয় বৃক্ষ সকলের জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় ছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সি, বি, ক্লার্ক মহোদয় দরিদ্র বালকগণের সুবিধার জন্য এই পুস্তক দ্বিতীয় বার মুদ্রিত করিয়া স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করেন। রক্সবর্গ, কেবল যে "ফ্লোরা ইণ্ডিকা" নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন এমন নহে। তিনি কোম্পানীর ব্যয়ে তিন ভাগে সম্পূর্ণ "প্লানট করমেন ডিলিয়ানি" নামে এক বৃহদাকার পুস্তকও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি করমণ্ডল উপকূলস্থিত ৩০০ আশ্চর্য্য বৃক্ষের বর্ণনা ও চিত্র সহ এই পুস্তক খানি মুদ্রিত করেন। ডাক্তার ফ্রান্সিস বুসানন কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষতা কার্য্যে ডাঃ রক্সবর্গ সাহেবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন ইনি পরে হ্যামিলটন নাম গ্রহণ করেন তিনি সেই সময়ে ভারতবর্ষের কৃষি বিস্তার বিশেষরূপ অনুসন্ধানে এবং দেশ বিদেশীয় উদ্ভিদের বিবরণ পূর্ণ একখানি গেজেটিয়ার গ্রন্থ সংকলনে অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। ডাক্তার হ্যামিলটন উদ্ভিদ্‌বিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যায় বিশারদ ছিলেন। তিনি নানা প্রকার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সেই গ্রন্থের কিয়দংশ আপন নামে মুদ্রিত করেন। অবশিষ্টাংশ অনেক বৎসর পরে মুদ্রিত হয়। ডাক্তার বুসানন হ্যামিলটন অল্পকাল মাত্রই বাগানের

তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। পরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ন্যাথানিয়াল ওয়ালিক্ তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। ইনি ইতিপূর্ব্বে শ্রীরামপুরস্থিত দিনেমারদিগের উপনিবেশের অস্ত্র-চিকিৎসক ছিলেন। ডাক্তার ওয়ালিক্ উদ্ভিদ্ বিদ্যায় নিপুণ ও অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। তিনি রাজকীয় উদ্ভিদ্ উদ্যানের কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াই দূরস্থ ও অজ্ঞাত কুমায়ুন, নেপাল, শ্রীহট্ট, তেনাসারম, পেন্যাঙ্গ, এবং সিংগাপুর প্রভৃতি প্রদেশের উদ্ভিদ্ সমূহ সংগ্রহে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বাস্তবিক ডাক্তার ওয়ালিক্ ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে উদ্ভিদ্ সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ইনি অনেকগুলি মৃত উদ্ভিদ্ নমুনা স্বরূপ লণ্ডনে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি নিজে এবং অন্য অন্য উদ্ভিদ্ বিদ্যাবিদগণ ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন গাছের নাম দিয়া ইউরোপের প্রধান প্রধান উদ্ভিদ্ বিদ্যালয়ে তাহার অনেক গুলি প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই বিতরণের সময়ে ওয়ালিক্ অন্যান্য উদ্ভিদ্ বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং বিতরণের জন্য প্রেরিত উদ্ভিদ্ সকলও বিতরণ করিয়াছিলেন। এই সকল বৃক্ষ এত অধিক পরিমাণে বিতরণ করা হইয়াছিল যে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের উদ্যান সম্বন্ধীয় রিপোর্টে আমরা দেখিতে পাই যে ডাক্তার গ্রিফিৎ, (যিনি ইংলণ্ডে ডাক্তার ওয়ালিকের অনুপস্থিতির সময়ে তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন) এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে ৫০ বৎসরে শিবপুর উদ্যানে যে সকল বৃক্ষ লতাদি সংগ্রহ করা হইয়াছিল তাহার সমস্তই বিতরণ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ডাক্তার ওয়ালিক মহামান্য কোম্পানীর বদান্যতায় সুন্দর রূপে রঞ্জিত চিত্র বিশিষ্ট "প্লাণ্টি আসিয়াটিক রেরিয়া" নামক তিন খণ্ড বৃহৎ পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ অব্দে ডাক্তার ওয়ালিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন এবং ১৮৫৪ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইউরোপে ডাক্তার ওয়ালিকের দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি কালে ডাক্তার গ্রিফিৎ তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ডাক্তার গ্রিফিতের অকাল মৃত্যুতে উদ্ভিদ্ শাস্ত্র তাহার একটী সমধিক পারদর্শী ও যত্নশীল ছাত্র হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। ডাক্তার গ্রিফিতের মৃত্যুর পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহার লিখিত টিকা টিপ্পনী এবং অগণ্য চিত্রাবলী নয় খণ্ডে প্রকাশ করেন। ডাক্তার ওয়ালিকের পর ডাক্তার হিউ ফ্যালকনার ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি একজন পক্ষিতত্ত্ববিৎ ছিলেন এবং প্রবাল পুঞ্জের অনুসরণের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ১৮৫৫ অব্দে ডাক্তার হিউ ফ্যালকনার শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন শিবপুর রাজকীয় উদ্ভিজ্জ উদ্যানের তত্ত্বাবধায়কের কর্ম্ম ত্যাগ করিলে ডাক্তার থমাস থমসন তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি একজন পরিব্রাজক ও উদ্ভিদ শাস্ত্রে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। ইনি ভারতবর্ষীয় বৃক্ষ লতাদির বিরাট বিতরণের সময় সার

জোসেফ হুকারের সহায় হইয়াছিলেন এবং নূতন 'ফ্লোরা ইণ্ডিকা' নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডের গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন। ১৮৬১ অব্দে ডাক্তার থমসন বিলাত যাত্রা করিলেন এবং ডাক্তার থমাস আন্ডারসন তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ডাক্তার থমাস আণ্ডারসন সিকিমস্থ হিমালয় পর্ব্বতে সিঙ্কোনা বৃক্ষের প্রথম চাষের সময় প্রভূত চেষ্টা ও বহু পরিশ্রম জনিত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ১৮৭০ অব্দে মৃত্যু-মুখে পতিত হন। ডাক্তার সি, বি ক্লাক মহোদয় আণ্ডারসনের কার্য্যে দুই বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মিঃ ক্লার্ক, তাহার কার্য্যকালে কতক-গুলি উদ্ভিজ্জ বিষয়ক বিবরণ মুদ্রিত করিয়া প্রভূত যশ উপার্জ্জন করিয়া-ছিলেন।

ক্রমশঃ।

ভারত রত্নমালা।

ভরতের ভ্রাতৃভক্তি।

মহাকবি বাল্মীকি কি শুভক্ষণেই রামা-য়ণের অবতারণা করিয়াছিলেন! তাঁহার রামায়ণের মধুর ভাব ভারতবাসীর অস্থি-মজ্জায় সঞ্চারিত হইয়া, তাহাদের মধ্যে স্বর্গীয় ভাব আনয়ন করিয়াছে। ইহা পিতৃমাতৃ ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ; ভ্রাতৃ প্রেম, পত্নী প্রেম এবং স্বামী প্রেমের অক্ষয় ভাণ্ডার এবং সখ্য রস, করুণ রস, ও বাৎসল্য রসের অগাধ জলধি। এরূপ উপদেশপূর্ণ এবং রসপূর্ণ মহাকাব্য আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহা-ভারতেও এই সকল মহাভাবের সমাবেশ আছে, কিন্তু পরম জ্ঞানী এবং পরম পণ্ডিত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, বহুচেষ্টাতেও তাঁহার ভারত কাব্য এ প্রকার সরল, সরস এবং বিশুদ্ধ ভাবপূর্ণ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি অনেক স্থলে শেষ রক্ষা করিতে না পারিয়া ভাবের পূর্ণতা সাধনে অক্ষম হইয়াছেন।

আমরা অদ্য রামায়ণোক্ত রামানুজ ভরতের অসাধারণ ভ্রাতৃভক্তি প্রদর্শন করিয়া, এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব। ইহা পাঠকবর্গের রুচিকর এবং আনন্দ জনক হইয়াছে বুঝিতে পারিলে, ধারা বাহিক রূপে রামায়ণ এবং মহাভারত প্রভৃতি অমূল্য ও অতুল্য গ্রন্থবর্ণিত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট চরিত্র সমূহের সুমোহন চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে ধারণ করিবার ইচ্ছা করি।

রামচরিত বাল্মীকির অমূল্য এবং অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এমন প্রেমময় এবং গুণময় চরিত্র ইতিহাসে অতি বিরল। তাই অনার্য্য চণ্ডাল জাতির অধিপতি গুহক রামচরণে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। রাম, জাতি, বর্ণ

বিচার না করিয়া, তাহাকে সখা সম্বোধন করিয়াছিলেন। সেও তাহাতে স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়াছিল। আবার ঐ জন্যই অসভ্য বানর কুলের অগ্রগণ্য সুগ্রীব, হনুমান, অঙ্গদ, প্রভৃতি রামের জন্য জীবনান্ত পণ করিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু এ প্রকার বহুগুণের আধার এবং শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রেরও অনিষ্ট করিবার জন্য শত্রু উপস্থিত হইয়াছিল। সে শত্রু আর কেহ নহে, তাঁহারই বিমাতা ভরত জননী কৈকেয়ী। ইহাও মহাকবির অপূর্ব্ব কৌশলের উদ্ভাবন। কৈকেয়ী শত্রুতাচরণ না করিলে, রামচরিত প্রস্ফুটিত হইত না। আর তাহা না হইলে, রামের পিতৃ মাতৃ ভক্তি, দশরথের বাৎসল্য এবং সীতার পাতিব্রত্য স্বর্ণাক্ষরে সমুজ্জল হইত না। ফলতঃ ইহারই জন্য রামের বল বিক্রমের বিকাশ, পিতৃ ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন, গুরুত্বের ও মহত্বের বিস্তার, ভ্রাতৃপ্রেমের, পত্নী প্রেমের এবং প্রজারঞ্জনের পূর্ণতা প্রকাশ। কৈকেয়ী শত্রুতা সাধন না করিলে, আমরা রামচরিতে এই সকল অপূর্ব্ব গুণ সন্নিবেশ দেখিতে পাইতাম না। আর মহামতি ভরতের ও অসাধারণ স্বার্থত্যাগ এবং অমানুষিক মহানুভাবকতা প্রস্ফুটিত হইত না।

ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যা প্রত্যাগমন করিয়া, যখন শুনিলেন যে, রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য যোগীবেশে বনগমন করিয়াছেন এবং পিতা মহারাজা দশরথ, রামশোকে গত জীবন হইয়াছেন, তখন জননীকে বলিতে লাগিলেন,—"মা! করিয়াছ কি? দুর্ব্বুদ্ধি পরিচালিতা হইয়া অযোধ্যার সর্ব্বনাশ করিয়াছ? আমাকে সহায়শূন্য এবং আশ্রয় বিহীন করিয়াছ? আর নিজের পরলোকের পথ কণ্টকিত করিয়াছ? ক্ষুদ্র আমি, অতি সামান্য আমি, কি শান্ত, দান্ত, বীর, বিক্রান্ত রামচন্দ্রের সিংহাসনের উপযুক্ত? সিংহের আসন কি শৃগালের উপভোগ্য হইবে? না, তাহা কখনই হইবে না! এখনই রামচন্দ্রকে আনয়ন করিতে বনে গমন করিব। "আমি তাঁহাকে বলিব,—'আর্য্য! স্ত্রীলোকের কথায় অযোধ্যার সর্ব্বনাশ করিবেন না, জননী কৌশল্যাকে নিদারুণ বেদনা প্রদান করিবেন না, এবং আমাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়া নিরাশা সাগরে নিমগ্ন করিবেন না'। রাম, যদি আমার কথায় কর্ণ পাত না করেন, তবে লক্ষ্মণের পরিবর্ত্তে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য জটা বল্কল পরিধান করিয়া, আমি রাম ও সীতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিব। হা হতভাগিনী জননি! তুমি যে ঘোর দুষ্কর্ম্ম সাধন করিয়াছ, তাহাতে চিরদিনের জন্য তোমার নামে কলঙ্ক ঘোষণা ঘোষিত হইবে, আর তোমার পুত্র বলিয়া, লোকে আমাকেও ঘৃণার চক্ষুতে দর্শন করিবে"।

ভরত, ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া, এই প্রকার

বিলাপ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা প্রভৃতি মহিষীগণ মনে করিয়াছিলেন যে, রাজ্য প্রাপ্তির সম্বাদে ভরত আনন্দে অধীর হইবে, কিন্তু তাঁহারা যখন দেখিলেন, শোক সন্তপ্ত, বিশুষ্ক এবং বিমলিন ভরত, রোদন করিতে করিতে কৌশল্যার চরণে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "জননি! এই পাপিষ্ঠের জন্যই সর্ব্বগুণ সম্পন্ন মহামতি রামচন্দ্রকে নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে, তখন তাঁহাদের ভ্রম দূর হইল। কৌশল্যা, ভরতকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামগত প্রাণ ভরতের শোকের শান্তি হইল না। অবশেষে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ দেব ও জাবালী প্রভৃতি মহর্ষিগণের উপদেশ অনুসারে পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধান করিয়া, ভরত রামচন্দ্রকে আনয়নার্থ বনগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বশিষ্ঠ কহিলেন,—"বৎস! রামচন্দ্রকে আনয়নের চেষ্টা বৃথা। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় রাম, পিতৃসত্য পরিপালন না করিয়া, কোন মতে গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন না। পিতার আদেশ অনুসারে তুমি অযোধ্যা রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, প্রজাপালন কার্য্যে ব্রতী হও। বৎস! রাজ্য অরাজক হইলে দেশের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। অতএব উপস্থিত ক্ষেত্রে রাজসিংহাসনে আরোহণ করা তোমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তুমি, রাজকার্য্য পরিচালনা না করিলে, মহামতি রামচন্দ্রও তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন"।

বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভরত কহিলেন,—"ভগবন্! আমি কি করিয়া রাজ কার্য্য পরিচালনা করিব? আমি যে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন রামচন্দ্রের চরণ রেণুরও সমতুল্য নহি। আমার বল, বুদ্ধি, ধ্যান, জ্ঞান, সমস্তই সেই রামচন্দ্রের শ্রীচরণ। তিনি ব্যতীত এ বিশাল কোশল রাজ্য কেহই পালন করিতে পারিবে না। দেব! তিনি শ্রেষ্ঠাদপি শ্রেষ্ঠ আর আমি ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র। এরূপ স্থলে আমি সেই সর্ব্বজনপূজ্য পরমপুরুষের সুযোগ্য সিংহাসনে উপবেশন করিয়া কলঙ্কের ভাগী হইতে পারিব না"। রাম জননী কৌশল্যা দেবী ও রাজকার্য্য পরিচালনার জন্য ভরতকে অনেক অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভরতের সেই একই উত্তর,—"জননি! সিংহের আসন শৃগালের শোভা পায় না"। কৈকেয়ী এক্ষণে প্রকৃতিস্থা হইয়াছেন। তিনি নিজ দোষ বুঝিতে পারিয়া অনুতাপের অনলে দগ্ধী ভূতা হইতেছেন।

শত্রুঘ্নও যারপরনাই সন্তাপিত হইয়া ভরতের চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত ছায়ার ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাজপুরী যেন শোক পুরীতে পরিণত হইয়াছে। সকলেই নিরানন্দ এবং নিরুৎসাহে নিমগ্ন। কিন্তু ভরতের বিশেষ দুঃখ এই যে, তাঁহার জন্যই রামের এই

রাজ্য নাশ এবং বনবাসের ব্যবস্থা। হায় রাজপুত্র হইয়া, রামচন্দ্র কিরূপে এই নিদারুণ বনবাস ক্লেশ সহ্য করিবেন? সীতা ও লক্ষ্মণের যারপর নাই ক্লেশ হইবে। এই সকল চিন্তা করিয়া, ভরতের যাতনার অবধি রহিল না। কি করিয়া রামকে ফিরাইতে পারিবেন, ইহাই তাঁহার অহোরহঃ চিন্তা হইল। পরিশেষে বন গমনই স্থিরীকৃত হইল। বনযাত্রার সংবাদে বহুসংখ্যক লোক রাম দর্শনে ব্যগ্র হইয়া, সঙ্গী হইবার প্রার্থনা করিতে লাগিল। ভরত কাহাকেও নিবারণ করিলেন না। অধিকন্তু পাত্র মিত্র অমাত্য এবং সৈন্য সামন্ত দিগকেও সজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। মনে করিলেন যে, শ্বাপদ সংকুল গহন বনে শক্তি সম্পন্ন হইয়া গমন না করিলে, বিপদের সম্ভাবনা। আর নিতান্ত নির্ব্বন্ধতাতেও যদ্যপি আর্য্য প্রত্যাগমন না করেন, তবে এই সকল লোক রামদর্শন সুখ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইবে। তিনি রামের সংবাদ অবগত হইবার নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে গুহক চণ্ডালের দেশে গমন করিলেন। গুহক, সৈন্য সামন্ত সহ ভরতকে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া, বিবিধ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু রোদন পরায়ণ ভরত, যখন তাহাকে সখা সম্বোধন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া রামের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সে আর আত্ম সম্বরণ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া কহিল,—"ভাই ভরত! আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে আমার সখার শত্রু মনে করিয়া কত নিষ্ঠুর কথা বলিয়াছি। তোমার হৃদয় যে, এত উচ্চ, আর রামের প্রতি যে তোমার এত অনুরাগ, ইহা আমি বুঝিতে না পারিয়া, যারপর নাই অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। এতক্ষণে বুঝিলাম, তুমি রামের উপযুক্ত ভ্রাতা, সূর্য্যবংশের সুযোগ্য সন্তান। আমি অধম চণ্ডাল, আমি মূর্খ। তোমাকে বুঝিবার আমার ক্ষমতা কোথায়? যাহা হউক আমিও সৈন্য সেনাপতি সমভিব্যাহারে তোমার সহিত শুভ যাত্রা করিয়া, রাম দর্শনে জীবন সফল করিব। তাঁহারা উভয়ে একত্র হইয়া চিত্রকূট অভিমুখে গমন করিলেন। চণ্ডাল গণ অরণ্য পথের সমস্ত বিবরণ অবগত ছিল, সুতরাং চিত্রকূট গমনে তাঁহাদের বিশেষ ক্লেশানুভব করিতে হইল না। উভয় সৈন্যের কোলাহল শব্দ শ্রবণ করিয়া, রামচন্দ্র, কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিলেন। আগন্তুকদিগের গতিবিধি নিরূপণ করিবার নিমিত্ত লক্ষ্মণ একটী উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে,—চণ্ডাল দলে মিলিত হইয়া, সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে ভরত, তাঁহাদের কুটিরাভিমুখে আগমন করিতেছেন। লক্ষ্মণ, তাহা দেখিয়াই রোষারুণ নেত্রে রামের নিকট গমন করিয়া কহিলেন,—"আর্য্য? কৈকেয়ী পুত্র ভরত, নিষ্কণ্টকে রাজ্য

করিবার জন্য সমর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া আসিতেছে। অনার্য্য চণ্ডাল জাতিও তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে। আপনি আদেশ প্রদান করুন, আমি একাকী গমন করিয়া, উহাদিগকে পরাজিত এবং দূরীভূত করিয়া দিই"।

লোক চরিত্রাভিজ্ঞ রামচন্দ্র, ভরতের চরিত্র সম্যকরূপে অবগত ছিলেন। তিনি লক্ষণের বাক্যে যারপরনাই অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"ভাই? তুমি নির্দ্দোষীকে দোষী বিবেচনা করিয়া, অতিশয় অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ। রাজ্য লাভে ভরতের অনুমাত্র ইচ্ছা নাই। সে রাজকার্য্যের অসহ্য গুরুভার পরিত্যাগ করিবার জন্যই আমার নিকট আসিতেছে। আর সৈন্য সামন্তও চণ্ডালগণ অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া, আমাদিগের দর্শন লালসায় এস্থানে আগমণ করিতেছে।" উভয়ের এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে দীন হীন কাঙ্গাল বেশে ভরত আগমন করিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"আর্য্য? আপনাদিগের সকল ক্লেশের মূলীভূত কৈকেয়ী পুত্র দুরাত্মা ভরত, আপনার চরণতলে শরণাগত হইতেছে। রাম, অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া, সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"ভাই! বিধাতার নির্ব্বন্ধ যাহা ছিল, তাহাই হইয়াছে। ইহার জন্য তোমার অথবা জননী কৈকেয়ীর কোন অপরাধ নাই। রাম, যত সান্ত্বনা প্রদান করেন, ভরতের শোকের উচ্ছাস ততই প্রবল হইতে লাগিল। অবশেষে অতি ক্লেশে শোকাবেগ প্রশমিত করিয়া, ভরত, কহিলেন, আর্য্য! আপনাকে অযোধ্যায় প্রতিগমন করিয়া, সিংহাসন গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা না করিলে, রাজ্য অরাজক, ছিন্ন ভিন্ন এবং ছার খার হইয়া যাইবে।

যদি নিতান্তই চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে যাপন করা বিধি সঙ্গত হয়, তবে আমি আপনার প্রতিনিধি হইয়া, সেই ব্রত পালন করিব"। রাম, কহিলেন "ভাই! তাহা কি হইতে পারে? পিতার আদেশ অনুসারে আমি সত্য পালন ব্রতে ব্রতী হইয়া, বনবাস স্বীকার করিয়াছি, এক্ষণে কিরূপে প্রত্যাগমন করিয়া, রাজ্য গ্রহণ করিব? পিতার আদেশ এবং আমার সম্মতি অনুসারে সিংহাসনে ন্যায়তঃ তোমারই অধিকার। অতএব ভাই! আর কাল বিলম্ব না করিয়া, অযোধ্যায় প্রতি গমন পূর্ব্বক অনাথ এবং অরাজক রাজ্যের ভার গ্রহণ কর। তোমার শাসন কার্য্যে প্রজাগণ সুখী হইলে, আমি পরম সুখ অনুভব করিব"। ভরত কহিলেন,—"দেব? জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে কনিষ্ঠের রাজ্য গ্রহণ কোন শাস্ত্রে আছে? বিশেষতঃ আমার রাজ্য শাসন করিবার বুদ্ধি বা ক্ষমতা নাই। আমি কনিষ্ঠ হইয়া, জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং চির জীবন জ্যেষ্ঠের চরণ সেবা করিব, ইহাই আমার ভাগ্য লিপি, আর তাহাই আমার

আন্তরিক বাসনা। এরূপ অবস্থায় রাজ্য শাসনের গুরুভার আমার ন্যায় অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করিলে, প্রজাগণ কোন প্রকারে সুখী হইতে পারিবেনা। আপনি যদ্যপি নিতান্তই অযোধ্যা প্রতিগমন না করেন, তবে লক্ষ্মণকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া, আমাকে চরণ সেবার অধিকারী করুণ"। রাম কহিলেন,—"ভাই? তাহা হইতে পারে না। তুমি লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ এই কারণে সিংহাসনে ধর্ম্ম সঙ্গত তোমারই অধিকার। অতএব তোমারই সিংহাসন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে, আমি তোমার প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইব"।

রামের এই গুরু গম্ভীর আদেশ বাণী শ্রবণ করিয়া ভরত, রাজ্য গ্রহণে আর অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারিলেন না। কিন্তু রামের চরণে পতিত হইয়া বিনম্র বচনে কহিলেন,—"আর্য্য! আমি রাজ কার্য্য পরিচালনা করিব বটে, কিন্তু সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারিব না। আপনার পবিত্র পাদুকা যুগল সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি রাজ ছত্রধারণ করিয়া, আমি রাজ কার্য্য পরিচালন করিব, আর, চতুর্দ্দশ বৎসরকাল জটা বল্কল ধারণ এবং ফল মূল ভক্ষণ করিয়া, বনবাস ব্রত সাধন করিব। চতুর্দ্দশ বর্ষ বিগত হইলে, আপনার রাজ্য আপনাকে প্রত্যাপণ করিয়া, বনবাস ব্রতের পরিসমাপ্তি করিব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আমার এই সংকল্প সাধনের অনুমতি প্রদান করুণ।" শত্রুঘ্ন ও রামের নিকট ঐ প্রকারে বনবাস ব্রত সাধনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রামচন্দ্র, প্রসন্ন চিত্তে তাঁহাদের প্রার্থনায় সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক পাদুকা যুগল অর্পণ করিলেন।

কি মহান্ অবদান! কি আশ্চর্য্য ত্যাগ স্বীকার!! ভরত, এই প্রকার ক্লেশ সহ্য ও ত্যাগ স্বীকার না করিলে, তাঁহার পক্ষে কোন দোষের কারণ হইত না। কিন্তু ধর্ম্মশীলের অগ্রগণ্য ভ্রাতৃভক্ত ভরত কি তাহা না করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন? না, তাহাতে তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না।

কি যেন তাঁহার অসম্পূর্ণ এবং অসমাপ্ত রহিয়া গেল, যেন তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য অঙ্গ হীন হইল। তাঁহার জীবন সর্ব্বস্ব রামের জন্য কি করিলে তাঁহার মাতৃকৃত দুষ্কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত হয় তিনি তাহাই অন্বেষণ করিতে ছিলেন। যদি প্রাণ দিলেও তিনি রামকে অযোধ্যায় লইয়া যাইতে পারিতেন তবে তাহাতে ও তিনি কাতর হইতেন না। কিন্তু রামের প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব, তাই ভরত বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক গৃহে থাকিয়া যোগী হইয়া ছিলেন। যেমন তেমন যোগী নহে, মহাযোগী, মহাসন্ন্যাসী। রাজ-ঐশ্বর্য্য অবহেলা করিয়া, তিনি কামনা বাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন এবং অপরিমিত ভোগ বিলাস সম্মুখে রাখিয়া বাসনা বিহীন বনবাসীর বিশুদ্ধ আচরণ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

নূতন সংবাদ।

১। ২৫এ জ্যৈষ্ঠ মহারাণী মেরীর জন্ম তিথি উপলক্ষে কলিকাতায় তোপ হইয়াছিল। আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি রাজ্ঞীকে চিরায়ুষ্মতি করুন।

২। উদয়পুরের মহারাজা প্রস্তাবিত হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফণ্ডে দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৩। আসামের শিলং হইতে গৌহাটী পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী চালাইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

৪। জুন মাসের রিভিউ অব রিভিউ পত্রে মিষ্টার ষ্টেড নাকি তাহার স্বলিখিত জীবনী প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই জীবনী পাঠে মহাত্মা ষ্টেডের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যাইতে পারিবে।

৫। বোম্বায়ে সার্ জর্জ্জ ক্লার্ক টেক্‌নিকেল লেবরেটরীর সংশ্রবে চীনা মাটীর বাসন প্রস্তুত করিবার এক কারখানা ও এই সঙ্গে ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য এক স্কুল স্থাপন করিয়াছেন।

৬। কার্পেথিয়া জাহাজ, টাইটানি জাহাজের আরোহীদিগের উদ্ধার করিতে যাওয়ার নিমিত্ত, যুক্ত প্রদেশের সেনেট কার্পেথিয়ার কাপ্তেনকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন এবং কংগ্রেস তাঁহাকে তিন হাজার টাকা মূল্যের এক পদক দিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে। এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রথম বিভাগে ২৯১৬ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ২৮৮৭ জন ও তৃতীয় বিভাগে ৩৯৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। বি, এস্, সি পরীক্ষায় মোট ১৬৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে গণিতে প্রথম বিভাগে একজন, দ্বিতীয় বিভাগে ৮ জন, ফিজিক্স প্রথম বিভাগে দুই জন, দ্বিতীয় বিভাগে ছয় জন কেমেষ্ট্রিতে প্রথম বিভাগে দুই জন, দ্বিতীয় বিভাগে নয় জন, ফিজিয়লজিতে দ্বিতীয় বিভাগে একজন এবং জিয়লজিতে দ্বিতীয় বিভাগে একজন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

৮। বি, এ পরীক্ষার ফল।

ইংরাজী অনার।

প্রথম বিভাগ।

ডরথিয়া, ই, লুইস—প্রাইভেট।

সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ।

হি, কে, মারগারেট—প্রাইভেট।

লুসি, নাইট— „

পাশ কোর্স।

প্রীতিবালা ঘোষাল—বেথুন কলেজ।

নির্ম্মলাবালা রায়— „

সুশীলা সেন „

বি এ পরীক্ষায় ছয় জন ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছে।

৯। কুমারী যামিনী সেন বিখ্যাত বঙ্গীয় সাহিত্যিক ৺ চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের কন্যা। ইনি সম্প্রতি গ্লাসগো রয়্যাল ফ্যাকল্টি অব্ ফিজিসিয়ান্ এণ্ড সার্জ্জনের ফেলো হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এ পদ এদেশীয় কোন স্ত্রীলোকেই প্রাপ্ত হন নাই। ইনি নেপালের মহারাণীর মহিলা ডাক্তার ছিলেন।

গ্রন্থাদি সমালোচনা।

আমরা সমালোচনার জন্য কয়েক খানি মাসিক পত্রিকা ও নূতন পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমালোচনা প্রদত্ত হইল। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে পত্রিকাগুলির দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

১। স্বাস্থ্য সমাচার—১ম বর্ষ ও ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩১৯। সুবিখ্যাত ডাক্তার কার্ত্তিক চন্দ্র বসু, এম, বি, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে 'রোগ কি?' 'ডাবের জল,' 'দন্ত,' 'নিঃশ্বাস প্রশ্বাস,' 'ব্যায়াম' ও 'ম্যালেরিয়া' শীর্ষক কয়েকটী প্রবন্ধ সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে। সেগুলি পাঠে সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে আশা করা যায়। এদেশে লোকের স্বাস্থ্য এক্ষণে যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এ সম্বন্ধে যেথান হইতে যত উপায় ও উপদেশ লাভ করা যায়, ততই মঙ্গল। পত্রিকাখানি দীর্ঘজীবিনী হইয়া জনসেবাব্রতপালনে রত থাকুক, এই আমাদের প্রার্থনা। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা, ঠিকানা ৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। বিজ্ঞান—শিল্প, কৃষি ও বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। ডাক্তার অমৃতলাল সরকার, এল্, সি, এস, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এই পত্রিকায় খ্যাতনামা বিজ্ঞানবিদ্‌গণের লেখা প্রকাশিত হইতেছে। ১ম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা (এপ্রিল ১৯১২) আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে 'তড়িৎ,' 'রসায়ন শাস্ত্র,' 'তাপ', 'তাপমাত্রা',' 'আলোক চিত্রণ,' ও 'মানবের ভবিষ্যৎ অবস্থা' এই কয়টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি সরল ভাষায় লিখিত ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আশা করা যায় যে, পত্রিকাখানি পাঠে পাঠকপাঠিকাগণের বিশেষ কল্যাণ হইবে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা, ঠিকানা ৫১ নং শাঁখারীটোলা, কলিকাতা।

৩। পতাকা—১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (এপ্রিল ১৯১২), শ্রীহরিচরণ দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। সাহিত্য, সমাজ, শিল্প, কৃষি ও ধর্ম্মাদি বিষয়ক এই মাসিক পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, ও প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা, ঠিকানা ৩৩ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। ব্রহ্মবিদ্যা—মাসিক পত্রিকা, (১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জৈষ্ঠ ১৩১৯)। ইহার সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, এম্, এ, বি, এ ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল এবং প্রকাশক শ্রীমন্মথ মোহন বসু, এম্, এ, ৮৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই পত্রিকাতে সুবিখ্যাত লেখকদিগের ধর্ম্ম-বিষয়ক ও শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইতেছে। পত্রিকাখানির আকার রয়েল ৮ পেজি ৬ ফরমা। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা। ইহাতে যে সকল শাস্ত্রীয় বিষয়ের আলোচনা হইতেছে তদ্দ্বারা অনেকের ধর্ম্মজীবনের বিশেষ সহায়তা হইবে।

৫। যুগধর্ম্ম—নুতন পুস্তক, শ্রীক্ষেত্র নাথ বন্দোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ প্রণীত। এই গ্রন্থে প্রাচীন ও নব যুগের ধর্ম্ম কি, ও যুগ কাহাকে বলে, তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মনুসংহিতা, উপনিষদ্ ও ভগবদ্গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ সকল হইতে শ্লোক উদ্ধৃত ও তাহার ব্যাখ্যা করিয়া কোন্ যুগে, কোন্ ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পুস্তকখানি সুপাঠ্য, মূল্য ৵০ আনা মাত্র। 'সেবালয়,' 'বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা,' 'মহাবোধি-সভা' ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

৬। নিমতা সনাতন-ধর্ম্ম-সাধিনী সভার ১৩১৭ সালের কার্য্য-বিবরণী। নিমতা ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করা সভার উদ্দেশ্য।

রাজপ্রাসাদ না পান্থশালা ?

১

কত দেশ, গিরি, নদী, প্রান্তর, কানন
ক্লান্তদেহ দরবেশ করিয়া ভ্রমণ,
নগর বলক্ নাম
যেন অমরের ধাম,
তথায় প্রবেশে এক রাজার ভবনে,
পান্থশালা ভাবি তাহা আপনার মনে।

২

সুশোভিত গৃহ এক করি দরশন
আপন দ্রব্যাদি তথা করিল স্থাপন,
কম্বল বিস্তৃত করি,
দরবেশ তদুপরি,
পরম সুখেতে যবে করিল শয়ন,
কেহ না জানিল তাহা প্রাসাদের জন।

৩

পরম সুখেতে তথা শয়ন করিয়া
ভ্রমণের দুঃখ যত গেল সে ভুলিয়া,
মনে নাহি শঙ্কালেশ,

চিন্তাশূন্য দরবেশ

আপন শয়নকক্ষে যেন নিজালয়ে,
দেখে তায় রক্ষী এক এমন সময়ে।

৪

"আসিলেক কোথা হতে কেবা এই জন,
কেন বা এখানে আসি করিল শয়ন,"
ভাবি ইহা নিজ মনে চলিলেক তত্ক্ষণে
যথায় পথিক ছিল শয্যায় শয়ান,
রাগদ্বেষশূন্য, শুদ্ধ, পবিত্রপরাণ।

৫

উচ্চ কণ্ঠে রুক্ষ স্বরে কহিল প্রহরী,
"কেবা তুমি ? হেথায় বা আসিলে কি করি ?
রাজার ভবন ইহা, জাননা কি তুমি তাহা,
দরিদ্র ভিক্ষুক একি সাহস তোমার,
হয় না হৃদয়ে তব ভয়ের সঞ্চার ?"

৬

ধীর ভাবে দরবেশ কহিল তখন,
"শ্রান্ত, ক্লান্ত, দেহ মম করিয়া ভ্রমণ,
এ পান্থনিবাসে তাই ভাবিয়াছি মনে ভাই
শয়নে রজনী আজি করিব যাপন,
প্রভাতে গন্তব্য পথে করিব গমন।"

৭

আরে কি নির্ব্বোধ তুই ! একি কথা তোর ?
শুনিয়া জ্বলিয়া উঠে অস্থিমজ্জা মোর,
রাজার প্রাসাদ ইহা, একি পরমাদ আহা !
পান্থশালা বলি তোর তাতে ভ্রম হয়,
দূর হ, দুর্ম্মতি ! কেন মরিবি নিশ্চয়।

৮

শুনি প্রহরীর এই রুক্ষ উচ্চ ভাষ,
আসিল অনেক লোক পথিকের পাশ।
নৃপতি আসেন তথা, শুনিয়া কৌতুক-কথা,
দরবেশ প্রহরীর মধ্যে যা হইল,
ছিলেন অদূরে তিনি যথা পান্থ ছিল।

৯

ডাকিয়া নৃপতি তবে কহে দরবেশে,
"পশুর অধম হেন নাহি কোন দেশে
রাজালয় সুশোভন, কোথা পথিক, ভবন,
উভয়ের ভেদাভেদ না বুঝে যে জন,
তার সম বুদ্ধিহীন না দেখি কখন।"

১০

শুনি রাজার বচন পান্থ সুবিনীত
উত্তর করিল তবে না হয়ে ব্যথিত,
"যদি হয় অনুমতি, অধম পথিক প্রতি,
জিজ্ঞাসি দু এক কথা, করিলে উত্তর,
অনুগ্রহপাশে বদ্ধ হইবে অন্তর।"

১১

"জিজ্ঞাস যা হয় তব জানিতে বাসনা,
পাইবে উত্তর তার নাহিক ভাবনা।"
কহে তবে দরবেশ,—"কহ মোরে হে নরেশ !
কেবা বল এ প্রাসাদ করিল নির্ম্মাণ,
ধরার মাঝারে যার নাহিক সমান ?"
"পূর্ব্ব পুরুষ মোর করি অর্থ ব্যয়
করিল নির্ম্মাণ ইহা নাহিক সংশয়।"
শুনিয়া রাজার বাণী, যোড় করি দুটী পাণি,
কহে পুনঃ দরবেশ বিনম্র বচন,
"তার পরে কেবা ভোগ করে এ ভবন ?"

১৩

"তাঁহার মৃত্যুর পর," কহিল রাজন্,
ভোগ করে এ প্রাসাদ তাঁহার নন্দন।"

"তৎপর কোন জন ভুঞ্জিয়াছে এ ভবন ?"
পথিকের এ কথায় কহে নরপতি,—
"মোর পিতা এবে যার স্বরগে বসতি।"

১৪

"বসতি করেন কেবা এখন হেথায় ?"
ইহার উত্তরে রাজা কহে পুনরায়,
"ভার্য্যা পুত্রকন্যাচয়
লয়ে থাকি এ আলয়।"
সবিনয়ে কহে পান্থ,—"কহ, নরবর!
কার ভোগ্য ইহা, তব হলে লোকান্তর ?"

১৫

"আমার তনয় যেই ভাবী নরপতি,
আমার পরেতে হেথা করিবে বসতি"।
ছাড়ি শ্বাস দীর্ঘতর
ধীরে কহে পান্থবর,
"এক যায়, আর আসে, থাকে না যথায়
সে স্থান কি নয় তবে পান্থশালা হায় ?"

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ।

বামারচনা।

ভগবতী ও মহাদেবের কথোপকথন।

ভ। মহাদেব রুদ্রনাথ ওহে শূলপাণি।
কিসেতে সন্তোষ তব বল নাথ শুনি॥
ম। পার্ব্বতি পরমেশ্বরি, পর্ব্বতবাসিনি।
আমার সন্তোষ কিসে শুন হররাণি॥
ভ। বল বল বল নাথ করিব শ্রবণ।
শুনিতে বাসনা বড় হইয়াছে মন॥
ম। পবিত্রা গঙ্গার জল তাহে বিল্বদল।
আমার মাথায় যদি দেয় গো কেবল॥
ভ। গঙ্গার শুনিয়া নাম কহেন ভবানী।
পবিত্রা গঙ্গা তোমার কিসে সন্তোষিণী॥
ম। গঙ্গায় করিয়া স্নান যেবা হরি বলে।
সন্তোষে ভাসিয়া গঙ্গা লন তারে কোলে॥
ভ। শ্রীহরি কিসেতে তবে হয়েন সন্তোষ।
কৃপা করি সেই কথা বল আশুতোষ॥
ম। স্মরণাগতেরে যেবা রাখে দিয়া প্রাণ।
দিবা নিশি হরি তার করেন কল্যাণ॥
ভ। তব মুখে শুনে সুখী হইলাম অতি।
আর কে শোনাবে শাস্ত্র বিনা পশুপতি॥
ম। দুর্গতিনাশিনি দুর্গে ভববিলাসিনি।
তোমার সন্তোষ কিসে গণেশজননি॥
ভ। দয়াবতী মম নাম জান মহেশ্বর।
দয়াতে সন্তোষে আমি থাকি পরাৎপর॥
ম। দয়াতে কি ধর্ম্ম হয় বল প্রিয়া শুনি।
তুমিও ত শাস্ত্র জান মহেশমোহিনী॥
ভ। দয়াতে উৎপত্তি ধর্ম্ম জানে সর্ব্বজন।
দয়ার দেহেতে থাকি ছায়ার মতন॥
ম। আর ধর্ম্ম কিসে হয় বল গুণবতি।
কালভয়নিবারিণি পরমপ্রকৃতি॥
ভ। পরম ধর্ম্মের কথা শুন দিগম্বর।
পর উপকার যেবা করে নিরন্তর॥
তাহার সমান ধর্ম্ম নাহি এ ধরায়।
চতুর্ব্বর্গ ফল সেই অনায়াসে পায়॥

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী।

নব বিধবা।

১

এ কি দেখি বসুন্ধরা,
মহাশূন্যতায় ভরা,
যে দিকে ফিরাই আঁখি আঁধার কেবল,
কেন আমি হেন দীন,
আশ্রয়-আশ্বাস-হীন,
করুণা-মমত-হীন কেন ভূমণ্ডল ?

২

এই যে ছিলাম হায়,
সুভগা—সম্রাজ্ঞী প্রায়,
এই তো অবনী ছিল কত আপনার,
শাঁখা লোহা ছিল হাতে,
উজল সিঁদুর মাথে,
এই যে সে তুমি ছিলে—কেবলি আমার !

৩

পলকে হারানু স'বি
নিভে গেল শশী রবি,
ঢাকিল বিশাল বিশ্ব ভয়ানক ভয়,
মহা দৈন্য, মহা পাপ,
বজ্রানল, ব্রহ্মশাঁপ,
চমকিছে, গরজিছে, কোথা প্রেমময় ?

৪

তুমি যে গো নাহি ঘরে,
তাই এ ভীষণ ঝড়ে,
শুষ্ক তৃণ সম আমি যেতেছি উড়িয়া,
আর সে করুণা মাখি,
শত অপরাধ ঢাকি,
কে লুকাবে স্নেহ বুকে সোহাগ মাখিয়া ?

৫

এরা
শাঁখা লোহা নিল খুলি,
সিঁথিতে মাখালে ধূলি—
তুমি সে বিবাহদিনে, শুভ ক্ষণে যবে,
অঙ্গুরীয় ধরি হাতে,
যে সিঁদুর দিলে মাথে,
বাড়ী ঘর ভরি গেল হুলু শঙ্খরবে—

৬

তাই আজি দিল মুছি,
সকল সৌভাগ্য ঘুচি,
ত্যজিলাম রাঙা শাড়ী সর্ব্ব আভরণ,
শুধু হাত থান প'রা,
এ কি বিভীষিকা ভরা,
আর বুঝি তব সনে হবে না মিলন ?

৭

সত্যই আমারে ফেলে,
তুমি নাথ ! চলে গেলে,
জীবন্ত আশ্বাস আশা দগ্ধ চিতানলে,
এ "বিদায়" প্রাণাধিক !
জনমেরি তরে ঠিক,
একেলা রহিব আমি শূন্য ধরাতলে ?

৮

চির-পরিচিত যারা,
সেই রবি, চন্দ্র, তারা,
তরু লতা, নদী গিরি, বার তিথি মাস,
সকলি তেমনি রবে,
আবার সকলি হবে,

আমারি আমারি শুধু হেন সর্বনাশ!

৯

ভীষণা যামিনী আসে,
বিষবহ্নি প্রতি শ্বাসে,
চির অমঙ্গলমাথা নগ্ন অন্ধকার,
নীরব রসালশাখে,
কুরবে পেচক ডাকে,
বাতাসে বাতাসে ছোটে মৌন হাহাকার!

১০

শুধিব কাহার কাছে,
বিশ্বে কি গো প্রাণ আছে,
কে করে বিদ্রূপভরা এ নিঠুর খেলা,
জীবনের সরবস্ব,
তাই শ্মশানের ভস্ম,
অশরণ আর্ত্ত রবে রূক্ষ অবহেলা?

লেখিকা শ্রীমা—

প্রেমের জয়।

শৈলজা সতত মলিন আননে
নীরবে একাকী চাহিয়ে রয়
সুনীল আকাশে তারকার দিকে
শশাঙ্ক অযুত কিরণময়।

সংসারের সুখ নাহি তার কিছু
ষোড়ষ বছরে দুঃখিনী সে যে,
নয়নের জল চির সহচরী,
সুখ হাসি সব ফুরায়ে গেছে।

কিছু সে বুঝে না, বালিকা আজিও
সরলতাময় কোমল হৃদি,
চাহে শুধু তার স্নেহ একটুকু
নয়নে দেখিতে হৃদয়নিধি।

কিন্তু সে নিঠুর কোমল লতিকা
চরণে দিয়াছে সরায়ে দূরে,
বুঝে না যে হায় এ কঠিন ব্যথা
ঐ প্রাণটুকু সহিতে কি পারে?

শৈলজা সতত দেবতার ন্যায়
পূজিত তাহারে হৃদয় দানে,
চরণে তাহার দিয়াছে ঢালিয়ে
স্নেহ, প্রীতি প্রেম যা ছিল প্রাণে।

আছিল তাহার জপমালা শুধু
'অমর' কথাটী রজনী দিবা,
আনত আননে রূক্ষ কেশরাশি
সিন্দুরবিন্দুতে শোভিত কিবা।

অত রূপরাশি পারিল না হায়!
বাঁধিয়া রাখিতে স্বামীরে তার,
অনাদরে তারে ঠেলে দিল পায়
ছিঁড়িল সবলে কুসুমহার।

উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে একদিন হায়
বন্ধুগণ সহ গিয়াছে কোথা?
রজনী আসিল, ফিরিল না তবু
ভিজিল শৈলের আঁখির পাতা।

সারাটী রজনী নীরবে বসিয়ে
কাটাল বালিকা ব্যাকুল মন,
প্রভাত হইল গাইল বিহগ
কোলাহল করে জগতজন।

শৈলজা উঠিয়ে লইল সংবাদ
আসে নাই স্বামী, নয়ননীরে
ভিজিছে কপোল, ডাকিছে নীরবে
—অনাথের নাথে হৃদয় ভরে।

দিন চলে যায় স্রোতের মতন,
আসে নাই স্বামী, শ্মশান গৃহে
দুঃখিনী শৈলজা কাটাইছে দিন
মলিন আনন, বিশুষ্ক দেহে।

নাই পিতা, মাতা, শ্বশুর শাশুড়ী,
ভাই, ভগ্নী, তারে করিতে স্নেহ,
এ বিশ্ব সংসারে ডাকি লয় কাছে
এমন তাহার নাহিক কেহ।

নয়নে সলিল, হৃদয়ে বেদনা,
অনাহারে দিন কাটিয়ে যায়,
অনিদ্রায় বসি কাটায় রজনী
কিছুতেই প্রাণে শান্তি না পায়।

অবশেষে বালা, দূর বনমাঝে
রচিল কুটীর নীরব স্থানে,
রহিবে সেখানে একাকিনী সে যে,
কাটিবে সময় ঈশের ধ্যানে।

কুড়িটী বছর হয়ে গেছে লয়
শান্তিমাখা বন গাহিছে পাখী—
কুসুম ফুটেছে স্তূপে, স্তূপে, স্তূপে
ফলভরে নত হয়েছে শাখী।

তাপসী যতনে আনিছে তুলিয়ে
ফুটন্ত কুসুম ভরিয়ে সাজি,
নিরঝর ঝরে ঝর ঝর করি,
নাচিছে সমীরে লতিকারাজি।

নয়নে করুণা, স্নেহে পূর্ণ বুক,
তাপসী কাননে দেবীর বেশে,
কুরঙ্গ শাবক হরষে খেলায়
কাছে আসি কভু কোলেতে বসে।

এক দিন সন্ধ্যা, আকাশে তারকা
উঠিল অসংখ্য ছড়ায়ে হাসি,
শশাঙ্ক অঞ্জলি পুরিয়ে পুরিয়ে
বর্ষিতে লাগিল জোছনা রাশি।

মালতী ফুটিল দিক্ আলো করি,
শেফালী হরষে ঝরিয়ে পড়ে,
কিশলয় দেহে জোছনা মাখিয়ে
দুলিছে সমীরে সোহাগভরে।

সারাটী দিবস রহি উপবাসে
ফল আনিবারে লইয়ে ডালি,
তাপসী কুটীরবাহিরে আসিল
চাহিল আকাশে নয়ন তুলি।

দেখিল ক্ষণেক আকাশের শোভা,
চলিল কাননে আনিতে ফল,
পড়িয়াছে মনে একটুকু কথা,
তাইতে নয়নে এসেছে জল।

কি একটু স্মৃতি বাধিল অন্তর,
একটি নিঃশ্বাস পড়িল ধীরে,
চমকি উঠিল, একি? কোথা আমি,
সত্বরে চলিল কুটীরে ফিরে।

কিন্তু কি ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে
চলিয়ে এসেছে অনেক দূরে,
অচেনা এ পথ, কোথা সে যাইবে,
কেনবা আসিল কুটীর ছেড়ে।

সহসা হুঙ্কার শুনিল নিকটে,
হেন কালে দস্যু আসিল ছুটে,
বলিল যা' আছে দে শীঘ্র মোদিগে
না' হলে এখনি লইব লুটে।